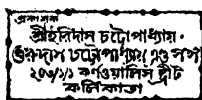


স্বামী

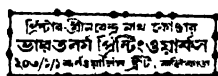
শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স্
২০৩১১, কর্ণওয়ালিস্ স্ট্রীট, কলিকাতা



একাদশ সংস্করণ—১ বৈশাখ, ১৩৪২

B13292



স্বামী

সৌদামিনী নামটা আমার বাবার দেওয়া। আমি প্রায়ই ভাবি, আমাকে এক বছরের বেশি ত তিনি চোখে দেখে যেতে পাননি, তবে এমন ক'রে আমার ভিতরে বাহিরে মিলিয়ে নাম রেখে গিয়েছিলেন কি কোরে? বীজমন্ডের মত এই একটি কথায় আমার সমস্ত ভবিষ্যৎ-জীবনের ইতিহাসটাই যেন বাবা ব্যক্ত ক'রে গেছেন!

রূপ? তা আছে মানি; কিন্তু, না গো না, এ আমার দেমাক্ নয়— দেমাক্ নয়। বুক চিরে দেখান যায় না, নইলে এই মুহূর্তেই দেখিয়ে দিছুম, রূপ নিয়ে গৌরব করবার আমার আর বাকি কিছু নেই— একেবারে—কিছু নেই! আঠারো—উনিশ? হাঁ, তাই বটে। বয়স আমার উনিশই। বাইরের দেহটা আমার তার বেশি প্রাচীন হ'তে পায়নি। কিন্তু, এই বুকের ভিতরটায়? এখানে যে বুড়ী তার উন-আশী বছরের শুকনো হাড়গোড় নিয়ে বাস ক'রে আছে, তাকে দেখতে পাচ্চো না? পেলে এতক্ষণ ভয়ে আঁৎকে উঠতে!•

একলা ঘরের মধ্যে মনে হ'লেও ত আজও আমার লজ্জায় মরুতে ইচ্ছা করে; তবে এ কলঙ্কের কাগী কাগজের উপর ঢেলে দেবার আমার কি আবশ্যক ছিল! সমস্ত লজ্জার মাথা খেয়ে সেইটাই ত আজ আমাকে বলতে হবে। নইলে আমার মুক্তি হবে কিসে?

সব মেয়ের মত আমিও ত আমার স্বামীকে বিয়ের মন্তরের ভিতর

দিয়েই পেয়েছিলুম। তবে কেন তাতে আমার স্বপ্ন উঠল না। তাই যে দামটা আমাকে দিতে হ'ল, আমার অতি বড় শত্রুর জন্তেও তা এক দিনের জন্তেও কামনা করিনে। কিন্তু দাম আমাকে দিতে হ'ল। যিনি সমস্ত পাপ-পুণ্য, লাভ-ক্ষতি, জায়-অজায়ের মালিক, তিনি আমাকে এক-বিন্দু রেহাই দিলেন না। কড়ান্ন ক্রান্তিতে আদায় ক'রে সর্বস্বাস্ত ক'রে যখন আমাকে পথে বার কোরে দিলেন—লজ্জা-সরমের আর যখন কোথাও কিছু অবশিষ্ট রাখলেন না—তখনই শুধু দেখিয়ে দিলেন, ওরে সর্বনাশী, এ তুই করেছিস্ কি? স্বামী যে তোর আত্মা। তাঁকে ছেড়ে তুই যাবি কোথায়? একদিন না একদিন তোর ঐ শূন্য বুকের মধ্যে তাঁকে যে তোর পেতেই হবে। এ জন্মে হোক, আগামী জন্মে হোক, কোটি জন্ম পরে হোক, তাঁকে যে তোর চাই-ই। তুই যে তাঁরই।

জানি যা হারিয়েছি, তার অনন্ত গুণ আজ ফিরে পেয়েছি। কিন্তু তবু যে এ কথা কিছুতেই ভুলতে পারিনে, এটা আমার নারীদেহ। আজ আমার আনন্দ রাখবার জায়গা নেই, কিন্তু ব্যথা রাখবারও যে ঠাই দেখি না প্রভু! এ দেহের প্রত্যেক অণু-পরমাণু যে অহোরাত্র কাঁদছে—ওরে অস্পৃশ্য, ওরে পতিতা, আমাদের আর বেঁধে পোড়াস্নে—আমাদের ছুটি দে, আমরা একবার খ'রে বাঁচি!

কিন্তু থাক্ সে কথা।

বাবা মারা গেলেন, এক বছরের মেয়ে নিয়ে মা বাপের বাড়ী চ'লে এলেন। মামার ছেলেপিন্ধে ছিল না, তাই গরীবের ঘর হলেও আমার আদর যত্নের ক্রটি হ'ল না। বড় বয়স পর্য্যন্ত তাঁর কাছে ব'সে ইংরাজি বাঙলা কত বই না আমি পড়েছিলুম।

কিন্তু মামা ছিলেন ঘোর নাস্তিক। ঠাকুর দেবতা কিছুই মানতেন না। বাড়ীতে একটা পূজা-অর্চনা, কি বার-ব্রতও কোন দিন হ'তে দেখিনি—এ সব, তিনি ছ'চক্ষে দেখতে পারতেন না।

নাস্তিক বই কি ?—আমা মুখে বলতেন বটে, তিনি ‘Agnostic’ কিন্তু সেও ত অকট। মস্ত ফাঁকি ! কথাটা যিনি প্রথম ‘আবিষ্কার’ করেছিলেন, তিনি ত শুধু লোকের চোখে ধুলো দিবার জন্তেই নিজেদের আগাগোড়া ফাঁকির পিছনে আর একটা আকাশ-পাতাল-জোড়া ফাঁকি জুড়ে দিয়ে আত্মরক্ষা করেছিলেন ! কিন্তু তখন কিছাই এ সব বুঝেছিলুম ! আসল কথা হচ্ছে, স্থবির চেয়ে বালির তাতেই গায়ে বেশি ফোঁস পড়ে। আমার মামারও হ’য়েছিল ঠিক সেই দশা !

শুধু আমার মা বোধ করি যেন লুকিয়ে ব’সে কি সব ক’রতেন। সে কিন্তু আমি ছাড়া আর কেউ জানতে পেত না। তা’ মা যা খুসি করুন, আমি কিন্তু মামার বিড়ে ষোল আনার জায়গায় আঁহারো আনা শিখে নিয়েছিলুম।

আমার বেশ মনে পড়ে, দোরগোড়ায় সাধু-সন্ন্যাসীরা এসে দাঁড়ালে সঙ দেখবার জন্তে ছুটে গিয়ে মামাকে ডেকে আনতুম। তিনি তাদের সঙ্গে এমনি ঠাট্টা সুরু ক’রে দিতেন যে, বেচারারা পালাবার পথ পেত না। আমি হেসে হাততালি দিয়ে গড়িয়ে লুটিয়ে পড়তুম। এমনি করেই আমার দিন কাটছিল।

শুধু মা এক-একদিন ভারি গোল বাধাতেন। মুখ ভার ক’রে এসে বলতেন, “দাদা, সহুর ত দিন দিন বয়স হচ্ছে, এখন থেকে একটু ধোঁজা-খুঁজি না করলে, সময়ে বিয়ে দেবে কি ক’রে ?”

মামা আশ্চর্য হ’য়ে বলতেন—“বলিস্ কি গিরি, তোর মেয়ে ত এখনো বারো পেরোয়নি—এর মধ্যেই তোর—সাহেবদের মেয়েরা ত এ বয়সে—”

মা কঁাদ-কঁাদ গলায় জবাব দিতেন, “সাহেবদের কথা কেন ভুলচ দাদা, আমরা ত সত্যিই আর সাহেব নই ! ঠাকুর-দেবতা না মানো, তাঁরা কিছু আর ঝগড়া করতে আসছেন না, কিন্তু পাড়ারগায়ের সমাজ ত আছে ? তাকে উড়িয়ে দেবে কি ক’রে ?”

মামা হেসে বলতেন, “ভাবিস্নে বোন সে সব আমি জানি। এই যেমন তোকে হেসে উড়িয়ে দিচ্ছি, ঠিক এমনি করে আমাদের নচ্ছার সমাজটাকেও হেসে উড়িয়ে দেব।”

মা মুখ ভার ক’রে বিড় বিড় ক’রে বকতে বকতে উঠে যেতেন ! মামা গ্রাহ্য করতেন না বটে, কিন্তু আমার ভারি ভয় হ’ত। কেমন ক’রে যেন বুঝতে পারতুম, মামা ষাই বলুন, মার কাছ থেকে আমাকে তিনি রক্ষা করতে পারবেন না।

কেন যে রিয়ের কথায় ভয় হ’তে শুরু হয়েছিল, তা বল্চি। আমাদের পশ্চিম-পাড়ার বুক চিরে যে নালাটা গ্রামের সমস্ত বর্ষার জল নদীতে ঢেলে দিত, তার দুই পাড়ে যে দু’ঘরের বাস ছিল, তার এক ঘর আমরা, অল্প ঘর গ্রামের জমিদার বিপিন মজুমদার। এই মজুমদারবংশ যেমন ধনী, তেমনি দুর্দাস্ত। গাঁয়ের ভেতরে-বাইরে এদের প্রতাপের সীমা ছিল না। নরেন ছিল এই বংশের একমাত্র বংশধর।

আজ এত বড় মিথোটা মুখে আনতে আমার যে কি হচ্ছে, সে আমার অন্তর্যামী ছাড়া আর কে জানবে বল, কিন্তু তখন ভেবেছিলুম, এ বুঝি সত্যি একটা জিনিস,—সত্যি বুঝি নরেনকে ভালবাসি।

কবে যে এই মোহটা প্রথম জন্মেছিল, সে আমি বলতে পারি না। কল্কাতায় সে বি-এ পড়ত, কিন্তু ছুটির সময় বাড়ী এলে মামার সঙ্গে ফিলজফি আলোচনা করতে প্রায়ই আসত। তখনকার দিনে Agnosticis’m’ই ছিল বোধ করি লেখাপড়া-জানাদের ফ্যানসান ! এই নিয়েই বেশিভাগ তর্ক হ’ত। কতদিন মামা তার গৌরব দেখাবার জন্য নরেনবাবুর তর্কের জবাব দিতে আমাকে ডেকে পাঠাতেন। কতদিন সন্ধ্যা ছাড়িয়ে রাত্রি হয়ে যেত, দু’জনের তর্কের কোন মীমাংসা হ’ত না। কিন্তু, আমিই প্রায় জিততুম, তার কারণও আর আজ আমার অবদিত নেই।

মাঝে মাঝে সে হঠাৎ তর্কের মাঝখানে ভঙ্গ দিয়ে মামার মুখপানে চেয়ে গভীর বিষ্ময়ে ব'লে উঠত, “আচ্ছা ব্রজবাবু, এই বয়সে এত বড় লজ্জিকের জ্ঞান, তর্ক করবার এমন একটা আশ্চর্য ক্ষমতা কি আপনি একটা ফিনোমিনন ব'লে মনে করেন না ?”

আমি গর্কে, সৌভাগ্যে ঘাড় হেঁট করতুম। ওরে হতভাগী ! সেদিন ঘাড়টা তোর চিরকালের মত একেবারে ভেঙ্গে মাটিতে লুটিয়ে পড়েনি কেন ?

মামা উচ্চ-অঙ্গের একটু হাশ্ব ক'রে বলতেন, “কি জ্ঞান নরেন, এ শুধু শেখাবার ক্যাপাসিটি।”

কিন্তু তর্কাতর্ক আমার তত ভাল লাগত না, যত ভাল লাগত তার মুখের মস্টিক্রিষ্টোর গল্প। কিন্তু গল্পও আর শেষ হ'তে চায় না, আমার অধৈর্য্যেরও আর সীমা পাওয়া যায় না। সকালে ঘুম ভেঙ্গে পর্যন্ত সারাদিন একশবার মনে করতুম, কখন বেলা পড়বে, কখন নরেনবাবু আসবে।

এমনি তর্ক ক'রে আর গল্প শুনে আমার বিয়ের বয়স বারো ছাড়িয়ে তেরোর শেষে গড়িয়ে গেল, কিন্তু বিয়ে আমার হ'ল না।

তখন বর্ষার নবর্যোবনের দিনে মজুমদারদের বাগানের একটা মস্ত ব'কুলগাছের তলা করা ফুলে-ফুলে একেবারে বোকাই হ'য়ে যেত। আমাদের বাগানের ধারের সেই নালাটা পার হ'য়ে আমি রোজ গিয়ে কুড়িয়ে আনতুম। সে দিন বিকালেও, মাঝার উপর গাঢ় মেঘ উপেক্ষা ক'রেই দ্রুতপদে যাচ্ছি, মা দেখতে পেয়ে ব'ল্লেন, “ওলো, ছুটে ত যাচ্ছিস, জল যে এল ব'লে।”

আমি বল্লুম, “জল এখন আসবে না মা, ছুটে গিয়ে দু'টো কুড়িয়ে আনি।”

মা ব'ল্লেন, “পোনের মিনিটের মধ্যে বৃষ্টি নামবে, সত্বে, কথা শোন—

যাস্নে। এই অবেলায় ভিজ়ে গেলে ঐ চুলের বোঝা আর শুকোবে না তা ব'লে দিচ্ছি।” •

আমি বললুম, “তোমার দু'টি পায়ে পড়ি মা, যাই। রুষ্টি এসে পড়লে মালীদের ওই চালাটার মধ্যে গিয়ে দাঁড়াব।”—বলতে বলতে ছুটে পালিয়ে গেলুম। মায়ের আমি একটি মেয়ে—দুঃখ দিতে আমাকে কিছুতেই পারতেন না। ছেলে-বেলা থেকেই ফুল যে কত ভালবাসি, সে ত তিনি নিজেও জানতেন, তাই চুপ ক'রে রইলেন। কতদিন ভাবি, সে দিন যদি হতভাগীর চুলের মুঠি ধ'রে টেনে আনতে মা, এমন ক'রে হয় ত তোমার মুখ পোড়াতুম না।

বকুল-ফুলে কৌচড় প্রায় ভর্তি হ'য়ে এসেছে, এমন সময় মা যা বললেন তাই হ'ল। ঝন্ ঝন্ করে রুষ্টি এল। ছুটে গিয়ে মালীদের চালার মধ্যে ঢুকে পড়লুম। কেউ নেই, খুঁটি ঠেস্ দিয়ে দাঁড়িয়ে মেঘের পানে চেয়ে ভাবচি, ঝন্ ঝন্ ক'রে ছুটে এসে কে ঢুকে পড়ল। মুখ ফিরিয়ে চেয়ে দেখি—ওমা! এ যে নরেনবাবু! কলকাতা থেকে তিনি যে বাড়ী এসেছেন, কৈ, সে তো আমি শুনিনি!

আমাকে দেখে চমকে উঠে বললেন, “অ্যা, সহ্ যে! এখানে?”

অনেক দিন তাঁকে দেখিনি, অনেক দিন তাঁর গলা শুনিনি, আমার বকের মধ্যে যেন আনন্দের ঢেউ ব'য়ে গেল। কাণ পর্যন্ত লজ্জায় রাঙা হয়ে উঠল;—মুখের পানে চেয়ে ত জবাব দিতে পারলুম না, মাটীর দিকে চেয়ে বললুম, “আমি ত রোজই ফুল কুড়ুতে আসি। কবে এলেন?”

নরেন মালীদের একটা ভাঙ্গা খাটিয়া টেনে নিয়ে ব'সে বললে, “আজ সকালে। কিন্তু তুমি কার হুকুমে ফুল চুরি কর শুনি?”

গম্ভীর গলায় আশ্চর্য্য হয়ে হঠাৎ মুখ তুলে দেখি, চোখ দু'টো তার চাপা হাসিতে নাচছে।

লজ্জা ! লজ্জা ! এই পোড়ার মুখেও কোথা থেকে হাসি এসে পড়ল, বল্লুম, “তাই বই কি ! কষ্ট ক’রে কুড়িয়ে নিলে বুঝি চুরি করা হয় ?”

নরেন ফস্ ক’রে দাঁড়িয়ে উঠে বললে, “আর আমি যদি ঐ কুড়োনা ফুলগুলো তোমার কৌচড়ের ভেতর থেকে আর একবার কুড়িয়ে নিই, তাকে কি বলে ?”

জানিনে, কেন আমার ভয় হ’ল, সত্যিই যেন এইবার সে এসে আমার আঁচল চেপে ধরবে। হাতের মুঠো আমার আঁলগা হ’য়ে গিয়ে চোখের পলকে সমস্ত ফুল ঝপ ক’রে মাটিতে পড়ে গেল।

“ও কি ক’ল্লে ?”

আমি কোনমতে আপনাকে সামলে নিয়ে বল্লুম “আপনাদেরই ত ফুল, বেশ ত, নিন্ না কুড়িয়ে।”

“এ্যা ! এত অভিমান !” ব’লে সে উঠে আমার আঁচলটা টেনে নিয়ে ফুল কুড়িয়ে কুড়িয়ে রাখতে লাগল। কেন জানিনে, হঠাৎ আমার দু’চোখ জলে ভ’রে গেল, আমি জোর ক’রে মুখ ফিরিয়ে আর একদিকে চেয়ে রইলুম।

সমস্ত ফুলগুলি কুড়িয়ে আমার আঁচলে একটা গেরো দিয়ে, নরেন তার জায়গায় ফিরে গেল। খানিকক্ষণ আমার পানে চুপ ক’রে চেয়ে থেকে বল্লেন, “যে ঠাট্টা বুঝতে পারে না, এত অল্পে রাগ করে, তার ষিলজফি পড়া কেন ? আমি কালই গিয়ে ব্রজবাবুকে ব’লে দেব, তিনি আর যেন পণ্ডশ্রম না করেন।”

আমি আগেই চোখ মুছে ফেলেছিলুম, বল্লুম, “কে রাগ করেছে ?”

“যে ফুল ফেলে দিলে।”

“ফুল ত আপনি প’ড়ে গেল।”

“মুখখানাও বুঝি আপনি ফিরে আছে ?”

“আমি ত মেঘ দেখছি।”

“মেঘ বুঝি এ দিকে ফিরে দেখা যায় না ?”

“কৈ যায় ?” ব’লে আমি ভুলে হঠাৎ মুখ ফেরাতেই ছ’জনের চোখোচোখি হ’য়ে গেল। নরেন ফিক্ ক’রে হেসে বললে, “একখানা আরসি থাকলে যায় কি না, দেখিয়ে দিভুম। নিজের মুখে চোখেই একসঙ্গে মেঘ-বিদ্যুৎ দেখতে পেতে ; কষ্ট ক’রে আকাশে খুঁজতে হ’ত না।”

আমি তখন চোখ ফিরিয়ে নিলুম। রূপের প্রশংসা আমি ঢের শুনেছি, কিন্তু নরেনের চাপা হাসি, চাপা ইঙ্গিত, সেদিন আমার বুকের মধ্যে চুকে আমার হৃৎপিণ্ডটাকে যেন সজোরে ছলিয়ে দিলে। এই ত সে পাঁচ বছর আগের কথা, কিন্তু আজ মনে হয়, সে সৌদামিনী বুঝি বা আর কেউ ছিল !

নরেন বললে, “মেঘ না কাটলে ব্রজবাবুকে ব’লে দেব, লেখা-পড়া শেখানো মিছে। তিনি আর যেন কষ্ট না করেন।”

আমি বললুম, “বেশ ত, ভালই ত। আমি ওসব পড়তেও চাইনে, বরং গল্পের বই পড়তেই আমার ঢের ভাল লাগে।”

নরেন হাততালি দিয়ে ব’লে উঠল, “দাঁড়াও ব’লে দিচ্ছি—আজ কাল নভেল পড়া হচ্ছে বুঝি ?”

আমি বললুম, “গল্পের বই তবে আপনি নিজে পড়েন কেন ?”

নরেন বললে, “সে শুধু তোমাকে গল্প বলবার জন্তে। নইলে পড়তুম না।” বৃষ্টির দিকে চেয়ে বললে, “আচ্ছা, এ জল যদি আজ না থামে ? কি কল্পবে ?”

বললুম, “ভিজ্জে-ভিজ্জে চ’লে যাব।”

“আচ্ছা, এ যদি আসামের পাহাড়ী বৃষ্টি হ’ত, তা হ’লে ?”

গল্প জিনিসটা চিরদিন কি ভালই বাসি ! একটুখানি গন্ধ পাবামাত্র আমার চোখের দৃষ্টি একমুহূর্তে আকাশ থেকে নরেনের মুখের উপর

নেমে এল। জিজ্ঞাসা করে ফেললুম, “সে দেশে রষ্টির মধ্যে বাব বেরোনো যায় না?”

নরেন বললে, “একেবারে না। গায়ে তীরের মত বেঁধে।”

“আচ্ছা, তুমি সে রষ্টি দেখেছ?” পোড়া মুখ দিয়ে ‘তুমি’ বার হ’য়ে গেল। ভাবি, জিভটা সঙ্গে সঙ্গে যদি মুখ থেকে ধ’সে প’ড়ে যেত!

সে বললে, “এর পর যদি একজন ‘আপনি’ ব’লে ডাকে, সে আর একজনের মরা-মুখ দেখে।”

“কেন দিবি দিলেন? আমি ত কিছুতেই ‘তুমি’ ব’লব না।”

“বেশ, তা হলে মরা-মুখ দেখো।”

“দিবি কিছুই না। ও আমি মানিনে।”

“কেমন মান না, একবার ‘আপনি’ বলে প্রমাণ করে দাও।”

মনে মনে রাগ করে ব’ললুম, পোড়ারমুখী! মিছে তেজ তোর রইল কোথায়? মুখ দিয়ে ত কিছুতে বার করতে পার্লিনে! কিন্তু দুর্গতির যদি ঐখানেই সেদিন শেষ হয়ে যেত!

ক্রমে আকাশের জল খামল বটে, কিন্তু পৃথিবীর জলে সমস্ত দুনিয়াটা যেন ঘুলিয়ে একাকার করে দিলে। সন্ধ্যা হয়-হয়। ফুল ক’টি ঝাঁচলে বাঁধা, কাদা-ভরা বাগানের পথে বেরিয়ে পড়লুম।

নরেন বললে, “চল, তোমাকে পৌঁছে দি।”

আমি বললুম, “না।”

মন যেন ব’লে দিলে, সেটা ভাল না। কিন্তু অদৃষ্টকে ডিঙিয়ে যাবো কি করে? বাগানের ধারে এসে ভয়ে হতবুদ্ধি হয়ে গেলুম। সমস্ত নালাটা জলে পরিপূর্ণ। পার হই কি করে?

নরেন সঙ্গে আসেনি, কিন্তু সেইখানে দাঁড়িয়ে দেখছিল। আমাকে চুপ করে দাঁড়াতে দেখে, অবস্থাটা বুঝে নিতে তার দেরী হ’ল না। কাছে এসে বললে, “এখন উপায়?”

আমি কাঁদ-কাঁদ হয়ে বল্লুম, “নালায় ডুবে মরি, সেও আমার ভালো, কিন্তু একলা অত দূর সদর রাস্তা ঘুরে আমি কিছতে যাব না। মা দেখলে—”

কথাটা আমি শেষ করুতেই পারলুম না।

নরেন হেসে বললে, “তারি আর কি, চল, তোমাকে সেই পিটুলি গাছটার উপর দিয়ে পার ক’রে দিই।”

তাই ত বটে! আত্মানন্দে মনে মনে নেচে উঠলুম। এতক্ষণ আমার মনে পড়েনি যে খানিকটা দূরে একটা পিটুলি গাছ বহুকাল থেকে ঝড়ে উপড়ে নালায় ওপর ত্রিঙ্কের মত প’ড়ে আছে। ছেলেবেলায় আমি নিজেই তার উপর দিয়ে এপার-ওপার হয়েছি।

খুসী হয়ে বল্লুম, “তাই চল—”

নরেন তার চেয়েও খুসী হয়ে বললে, “কেমন মিষ্টি শোনালে বলত!”

বল্লুম, “যাও—”

সে বললে, “নির্ঝিন্দে পার না ক’রে দিয়ে কি আর যেতে পারি!”

বল্লুম, “তুমি কি আমার পারের কাণ্ডারী না কি?”

আমি আজও ভেবে পাইনি, এ কথা কি ক’রেই বা মনে এল এবং কেমন ক’রেই বা মুখ দিয়ে বা’র করলুম। কিন্তু সে যখন আমার মুখপানে চেয়ে একটু হেসে বললে, “দেখি, তাই যদি হ’তে পারি”— আমি ঘেঁষায় যেন ম’রে গেলুম!

সেখানে এসে দেখি, গার হওয়া সোজা নয়। একে ত স্থানটা গাছের ছায়ায় অন্ধকার, তাতে, সেই পিটুলি গাছটাই জলে ভিজে ভিজে যেমন পিছল, তেমনি উঁচু নীচু হয়ে আছে। তলা দিয়ে সমস্ত রষ্টির জল ছহ শব্দে বয়ে যাচ্ছে—আমি একবার পা বাড়াই, একবার টেনে নিই! নলেন খানিকক্ষণ দেখে বললে, “আমার হাত ধ’রে যেতে পারবে?”

বল্লুম, “পারব।” কিন্তু তার হাত ধ’রে এমনি কাণ্ড করলুম যে,

সে কোন মতে টাল সাইলে এ দিকে লাফিয়ে প'ড়ে আত্মরক্ষা করলে। কয়েক মুহূর্ত সে চুপ ক'রে আমার মুখপানে চেয়ে রইল, তার পরেই তার চোখ দু'টো যেন ঝক্ ঝক্ ক'রে উঠল। বললে, “দেখবে, একবার সত্যিকারের কাণ্ডারী হ'তে পারি কি না?”

আশ্চর্য্য হয়ে বললুম, “কি ক'রে?”

“এমনি ক'রে” বলেই সে নত হ'য় আমার দুই হাঁটুর নীচে এক হাত, ঘাড়ের নীচে অণ্ড হাত দিয়ে চোখের নির্মিষে তার বুকের কাছে তুলে নিয়ে সেই গাছটার উপর পা দিয়ে দাঁড়াল। ভয়ে আমি চোখ বুজে বাঁ হাত দিয়ে তার গলা জড়িয়ে ধরলুম। নরেন দ্রুতপদে পার হ'য়ে এপারে চ'লে এল। কিন্তু নামাবার আগে—আমার ঠোঁট দু'টোকে একেবারে যেন পুড়িয়ে দিলে। কিন্তু থাক্ গে! কম ঘেঁষায় কি আর এ দেহের প্রতি-অঙ্গ অহর্নিশি গলায় দড়ি দিতে চায়!

শিউরতে শিউরতে বাড়ী চ'লে এলুম, ঠোঁট দু'টো তেমনি জ্বলতেই লাগল বটে, কিন্তু সে জ্বালা লঙ্কামরিচখোরের জ্বলুনির মত যত জ্বলতে লাগল জ্বালার তৃষ্ণা তত বেড়ে যেতেই লাগল।

মা বললেন, “ভায়া মেয়ে ভুই সছু,—এলি কি কোরে? নালাটা ত জলে জলমগ্ন হয়েছে দেখে এলুম। সেই গাছটার ওপর দিয়ে বুঝি হেঁটে এলি? প'ড়ে মরতে পারলিনে!”

“না মা, সে পুণ্য থাকলে আর এ গল্প লেখবার দরকার হবে কেন?”

তার পরদিন নরেন, আমার সঙ্গে দেখা কর্ত্তে এল। আমি সেই-ধানেই বসেছিলাম,—তার পানে চাইতে পারলুম না, কিন্তু আমার সর্বাঙ্গে কাঁটা দিয়ে উঠল। ইচ্ছে হ'ল ছুটে পালাই, কিন্তু ঘরের পাকা মেঝে যেন চোরা বালির মত আমার পা দু'টোকে একটু একটু ক'রে গিলতে লাগল—আমি নড়তেও পারলুম না, মুখ তুলে দেখতেও পারলুম না।

নরেনের যে কি অসুখ হ'ল, তা শয়তানই জানে, অনেক দিন পর্য্যন্ত

আর সে কল্কাতায় গেল না। রোজই দেখা হতে লাগল! মা মাঝে মাঝে বিরক্ত হয়ে আমাকে আড়ালে ডেকে পাঠিয়ে বলতে লাগলেন, “ওদের পুরুষ মানুষদের লেখাপড়ার কথাবার্তা হয়, তুই তাব মধ্যে হাঁ ক’রে ব’সে কি শুনিস্ বল ত? যা বাড়ীর ভেতরে যা। এত বড় মেয়ের যদি লজ্জা-সরম একটুকু আছে।”

এক-পা এক-পা ক’রে আমার ঘরে চ’লে যেতুম, কিন্তু কোন কাজে মন দিতে পারতুম না। যতক্ষণ সে থাকত তার অস্পষ্ট কর্তৃত্বের অবিশ্রাম বাইরের পানেই আমাকে টানতে থাকত।

আমার মামা আর যাই হোন, তাঁর মনটা পঁ্যাচালো ছিল না। তা’ছাড়া, লিখে প’ড়ে তর্ক ক’রে ভগবানকে উড়িয়ে দেবার কন্দিতেই সমস্ত অন্তঃকরণটা তাঁর এমনি অল্পক্ষণ ব্যস্ত হয়ে থাকত যে, তাঁর নাকের ডগায় কি যে ঘটছে তা দেখতে পেতেন না। আমি এই বড় একটা মজা দেখেছি, জগতের সব চেয়ে নামজাদা নাস্তিকগুলোই হচ্ছে সব চেয়ে নিরেট বোকা। ভগবানের যে লীলার অন্ত নেই। তিনি যে এই ‘না’ রূপেই তাদের পোনর-আনা মন ভরে থাকেন, এ তারা টেরই পায় না। সপ্রমাণ হোক, অপ্রমাণ হোক, তাঁর ভাবনাতে সারাদিন কাটিয়ে দিয়ে বলে, “সংসারে মানুষগুলো কি বোকা! তারা সকাল-সন্ধ্যায় ব’সে মাঝে মাঝে ভগবানের চিন্তা করে!” আমার মামারও ছিল সেই দশা! তিনি কিছুই দেখতে পেতেন না। কিন্তু মা তা’ নয়। তিনি যেন আমারই মত মেয়েমানুষ। তাঁর দৃষ্টিকে কঁাকি দেওয়া ত সহজ ছিল না! আমি নিশ্চয় জানি, মা আমাদের সন্দেহ ক’রেছিলেন।

আর সামাজিক বাধা আমাদের দু’জনের মধ্যে যে কত বড় ছিল, এ শুধু যে তিনি জানতেন, আমি জানতুম না, তা নয়। ভাবলেই আমার বুকের সমস্ত রস শুকিয়ে কাঠ হয়ে উঠত, তাই ভাবনার এই

বিল্লী দিক্টাকে আমি ছুঁহাতে ঠেলে রাখতুম। কিন্তু শত্রুর বদলে যে বহুকেই ঠেলে ফেলচি, তাও টের পেতুম। কিন্তু হ'লে কি হয়? যে মাভাল একবার কড়া-মদ খেতে শিখেচে, জল দেওয়া মদে আর তার মন ওঠে না! নির্জলা বিষের আঙুনে কলজে পুড়িয়ে তোলাতেই যে তখন তার মস্ত সুখ।

আর একটা জিনিস আমি কিছুতেই ভুলতে পারতুম না। সেটা মজুমদারদের ঐশ্বর্যের চেহারা! ছেলে বেলা মায়ের সঙ্গে কতদিনই ত তাদের বাড়ীতে বেড়াতে গেছি। সেই সব ঘোর দোর ছাঁবি দেওয়াল-গিরি, আলমারি, সিন্দুক, আসুঁবাব-পত্রের সঙ্গে কোন্ একটা ভাবী ছোট্ট একতালা খুঁতুরবাড়ীর কদাকার মূর্তি কল্পনা করে মনে মনে আমি যেন শিউরে উঠতুম!

মাসখানেক পরে একদিন সকালবেলা নদী থেকে স্নান করে বাড়ীতে পা দিয়েই দেখি, বারান্দার ওপর একজন প্রোঁতা-গোছের বিধবা জ্বীলোক মায়ের কাছে বসে গল্প করছে। আমাকে দেখে মাকে জিজ্ঞাসা করলে, “এইটি বুঝি মেয়ে?”

মা ঘাড় নেড়ে বললেন, “হাঁ মাঁ, এই আমার মেয়ে। বাড়ন্ত গড়ন, ন'ইলে—”

জ্বীলোকটা হেসে বললে, “তা হোক। ছেলেটির বয়সও প্রায় ত্রিশ, ছ'জনের মানাবে ভাল। আর ঐ শুন্তেই দোজবরে, নইলে যেন কাস্তিক।”

আমি দ্রুতপদে ঘরে চলে গেলুম। বুঝলুম, ইনি ঘটক ঠাকুরণ, আমার সম্বন্ধ এনেছেন।

মা টেচিয়ে বললেন, “কাপড় ছেড়ে একবার এসে বোস্ মা।”

কাপড় ছাড়া চুলোয় গেল, ভিজে কাপড়েই দোরের আড়ালে দাঁড়িয়ে কাণ পেতে শুন্তে লাগলুম। বুকের কাঁপুনি যেন আরুণামতে

চায় না। শুনতে পেলুম, চিতোর গ্রামের কে একজন রাধাবিনোদ যুধুষ্যের ছেলে ঘনশ্রাম। পোড়াকপালে না কি অনেক ছুঁধ ছিল, তাই আজ যে নাম জপের মন্ত্র, সে নাম শুনে সেদিন গা জলে যাবে কেন !

শুনলুম, বাপু নেই, কিন্তু মা আছেন। ছোট ছুঁটি তাই এক ভায়ের বিয়ে হ'য়েচে, একটি এখনও পড়ে। সংসার বড়রই ষাড়ে, তাই, এন্ট্রান্স পাশ করেই রোজগারের ধান্দায় পড়া ছাড়তে হ'য়েছে। ধান, চাল, ভিসি, পাট প্রভৃতির দালালি ক'রে, উপায় মন্দ করেন না। তাঁরই উপর সমস্ত নির্ভর। তা'ছাড়া ঘরে নারায়ণ শিলা আছেন, দুটো গরু আছে, বিধবা বোন আছে—নেই কি ?

—নেই শুধু সংসারের বড়-বৌ। সাত বছর আগে বিয়ের এক মাসের মধ্যেই তিনি মারা যান, তারপর এতদিন বাদে এই চেঁচা। সাতবছর। ঘটকীকে উদ্দেশ্য ক'রে মনে মনে বললুম, “পোড়ারমুখী এতদিন কি তুই শুধু আমার মাথা খেতেই চোখ বুজে ঘুচ্ছিলি ?”

মায়ের ডাকাডাকিতে কাপড় ছেড়ে কাছে এসে বসলুম। সে আমাকে খুঁটিয়ে দেখে বললে, “মেয়ে পছন্দ হয়েছে, এখন দিন স্থির করলেই হ'ল।” মায়ের চোখ দুটিতে জল টলটল করতে লাগল, বললেন, “তোমার মুখে ফুলচন্দন পড়ুক মা, আর কি বলব !”

মামা শুনে বললেন, “এন্ট্রান্স ? তবে ব'লে পাঠা, এখন বছর দুই সত্বর কাছে ইংরিজি প'ড়ে যাক, তবে বিয়ের কথা কওয়া যাবে।”

মা বললেন, “তোমার পায়ে পড়ি দাদা, অমত কোরো না, এমন সুবিধে আর পাওয়া যাবে না। দিতে খুতে কিছু হবে না—”

মামা বললেন “তাহলে হাত-পা বেঁধে গঙ্গায় দিগে যা, সেও এক পয়সা চাইবে না।”

মা বললেন, “পনেরয় পা দিলে যে—”

মামা বললেন, “তা ত’দেবেই ; পনর বছর বেঁচে রয়েছে যে !”

মা রাগে দুঃখে কাঁদ-কাঁদ হ’য়ে বললেন, “তুমি কি ওর তবে বিয়ে দেবে না দাদা ? এর পরে একেবারেই পাত্র জুটবে না ।”

মামা বললেন, “সেই ভয়ে ত আগে থেকে ওকে জলে ফেলে দিতে পারা যায় না ।”

মা বললেন, “ছেলেটাকে একবার নিজের চোখে দেখে এসো না দাদা, পছন্দ না হয়, না দেবে ।”

মামা বললেন, “সে ভাল কথা । রবিবার যাব ব’লে চিঠি লিখে দিচ্ছি ।”

ভাঙচির ভয়ে কথাটা মা গোপনে রেখেছিলেন এবং মামাতকও সাবধান ক’রে দিয়েছিলেন । তিনি জানতেন না, এমন চোখ-কাণও ছিল—যাকে কোন সতর্কতা কাঁকি দিতে পারে না ।

বাগানে এক টুকরো শাকের ক্ষেত করেছিলুম । দিন দুই পরে ছপূর-বেলা একটা ভাঙা খুন্টি নিয়ে তার ঘাস তুলুচি, পায়ের শব্দে মুখ ফিরিয়ে দেখি, নরেন । তার সে রকম মুখের চেহারা অনেক দিন পরে আর একবার দেখেছিলুম, সত্যি, কিন্তু আগে কখনো দেখিনি । বুকে এমন একটা ব্যথা বাজল, যা কখনো কোন দিন পাই নি । সে বললে, “আমাকে ছেড়ে কি সত্যিই চলে ?”

কথাটা বুকেও যেন বুঝতে পারলুম না । ব’লে ফেললুম, “কোথায় ?”
সে বললে, “চিতোর ।”

স্পষ্ট হ’বামাত্রই লজ্জায় আমার মাথা হেঁট হ’য়ে গেল—কোন উত্তর মুখে এলো না ।

সে পুনরায় বললে, “তাই আমিও বিদায় নিতে এসেছি ; বোধ হয় জন্মের মতই । কিন্তু তার আগে ছ’টো কথা বলতে চাই—কনবে ?”

বলতে বলতেই তার গলাটা যেন ধ’রে গেল । তবুও আমার মুখে কথা

যোগাল না—কিন্তু মুখু তুলে চাইলুম। এ কি? দেখি, তার ছ'চোখ ব'য়ে ঝর্-ঝর্ ক'রে জল প'ড়ছে।

ওরে পতিতা! ওরে দুর্বল নারী! মাহুঘের চোখের জল সহ্য করবার ক্ষমতা ভগবান্ তোরে যখন একেবারে দেন নি, তখন তোরা আর সাধ্য ছিল কি! দেখতে দেখতে আমারও চোখের জলে বুক ভেসে গেল। নরেন কাছে এসে কোঁচার খুঁট দিয়ে আমার চোখ মুছিয়ে দিয়ে হাত ধ'রে বললে, “চল, ওই গাছটার তলায় গিয়ে বসি গে—এখানে কেউ দেখতে পাকে।”

মনে বুঝলুম, এ অত্মায়—একান্ত অত্মায়! কিন্তু তখনও যে তার চোখের পদতা ভিজে, তখনও যে তার কণ্ঠস্বর কান্নায় ভরা।

বাগানের একপ্রান্তে একটা কাঁটালি-টাপার কুঞ্জ ছিল, তার মধ্যে সে আমাকে ডেকে নিয়ে গিয়ে বসালে।

একটা ভয়ে আমার বুকের মধ্যে দ্রুত দ্রুত করছিল, কিন্তু সে নিজেই দূরে গিয়ে ব'সে বললে, “এই একান্ত নির্জন স্থানে তোমাকে ডেকে এনেছি বটে, কিন্তু তোমাকে ছোঁব না। এখনও তুমি আমার হও নি।”

তার শেষ-কথায় আবার পোড়া চোখে জল এসে পড়ল। আঁচলে চোখ মুছে মাটির দিকে চেয়ে চুপ ক'রে ব'সে রইলুম।

তার পরে অনেক কথাই হ'ল, কিন্তু থাক্ গে সে সব। আজও ত প্রতিদিনকার অতি তুচ্ছ ঘটনাটি পর্য্যন্ত মনে করতে পারি,—মরণেও যে বিশ্বাস আসবে, সে আশা করতেও যেন ভরসা হয় না; একটা কারণে আমি আমার এত বড় দুর্গতিতেও কোন দিন বিধাতাকে দোষ দিতে পারিনি। স্পষ্ট মনে পড়ে, আমার চিন্তের মাঝে থেকে নরেনের সংস্রব তিনি কোন দিন প্রসন্নচিত্তে গ্রহণ করেন নি। সে যে আমার জীবনে কত বড় মিথ্যে, এ তো তাঁর অগোচর ছিল না। তাই তার প্রণয়-নিবেদনের মুহূর্তের উদ্বেজনা পরক্ষণের কত বড় অবসাদে যে ডুবে

যেত, সে আমি ভুলিনি। যেন কার কত চুরি-ডাকাতি, সর্বনাশ ক'রে ঘরে ফিরে এলুম, এমনি মনে হ'ত। কিন্তু এমনি পোড়া কপাল যে, অন্তর্যামীর এত বড় ইঙ্গিতেও আমার হুঁস হয় নি। হবেই বা কি ক'রে? কোন দিন ত শিখিনি যে, ভগবান্ মাছুষের বুকের মধ্যেও বাস করেন। এ সব তাঁরই নিষেধ।

মামা পাত্র দেখতে যাত্রা করলেন। যাবার সময় কতই না ঠাট্টা-তামাসা ক'রে গেলেন। মা মুখ চুণ করে দাঁড়িয়ে রইলেন, মনে মনে বেশ বুললেন, এ যাওয়া পণ্ডশ্রম। পাত্র তাঁর কিছুতে পছন্দ হবে না।

কিন্তু আশ্চর্য্য, ফিরে এসে আর বড় ঠাট্টা বিক্রপ করলেন না। বললেন, “হাঁ, ছেলেটি পাশ-টাস তেমন কিছু করতে পারেনি বটে, কিন্তু মুখ্য ব'লেও মনে হ'ল না! তা ছাড়া বড় নব্র, বড় বিনয়ী। আর একটা কি জানিস্ গিরি, ছেলেটির মুখের ভাবে কি একটু আছে, ইচ্ছে হয়, ব'সে ব'সে আরও হৃদগু আলাপ করি।”

মা আঙ্কাদে মুখখানি উজ্জ্বল ক'রে বললেন, “তবে আর আগন্তি ক'রো না দাদা, মত দাও—সহুর একটা কিনারা হ'য়ে যাক্।”

মামা বললেন, “আচ্ছা, ভেবে দৌধি।”

আমি আড়ালে দাঁড়িয়ে নিরাশার আশাটুকু বুকে চেপে ধ'রে মনে মনে বললুম, “যাক্, মামা এখনো মনস্থির করতে পারেন নি। এখনও বলা যায় না। কিন্তু কে জ্ঞান্ত, তাঁর ভাগ্যীর বিয়ের সম্বন্ধে মতিস্থির করবার পূর্বেই তাঁর নিজের সম্বন্ধে মতিস্থির করবার ডাক এসে পড়বে। যাকে সারাজীবন সন্দেহ ক'রে এসেছেন, সে দিন অত্যন্ত অকস্মাৎ তাঁর দূত এসে যখন একেবারে মামার শিয়রে দাঁড়াল, তখন তিনি চমকে গেলেন। তাঁর কথা শুনে আমাদেরও বড় কম চমক লাগল না। মাকে কাছে ডেকে বললেন, “আমি মত দিয়ে যাচ্ছি বোন, সহুর সেইখানেই

বিয়ে দিস্। ছেলোটর যথার্থ ভগবানে বিশ্বাস আছে। মেয়েটা সুখে থাকবে।”—অবাক্ কাণ্ড ! কিন্তু অবাক্ হলেন না শুধু মা। নাস্তিকতা তিনি ছ’চক্ষে দেখতে পারতেন না। তাঁর ধারণা ছিল, মরণকালে সবাই ঘুরে ফিরে হরি বলে। তাই তিনি বলতেন, ‘মাতাল তার মাতাল বন্ধুকে যত ভালই বাসুক না কেন, নির্ভর করবার বেলায় করে শুধু তাকে—যে মদ খায় না।’ জানি না, ফখাটা কতখানি সত্যি।

হৃদরোগে মামা মারা’গেলেন, আমরা পড়লুম অকুল-পাথারে। সুখে হুঃখে কিছু দিন কেটে গেল বটে, কিন্তু যে বাড়ীতে অবিবাহিতা মেয়ের বয়স পোনের পার হ’য়ে যায়, সেখানে আলস্যভরে শোক করবার সুবিধা থাকে না। মা চোখ মুছে উঠে ব’সে আবার কোমর বেঁধে লাগলেন।

অবশেষে অনেক দিন অনেক কথা কাটাকাটির পর, বিবাহের লগ্ন যখন সত্যিই আমার বুক এসে বিঁধল, তখন বয়সও ষোল পার হ’য়ে গেল। তখনও আমি প্রায় এমনিই লম্বা। আমার এই দীর্ঘ দেহটার জন্ত জননীর লজ্জা ও কুণ্ঠার অবধি ছিল না। রাগ ক’রে প্রায়ই ভৎসনা করতেন, ‘হতভাগা মেয়েটার সবই সৃষ্টিছাড়া!’ একে ত বিয়ের কনের পক্ষে সতের বছর একটা মারাত্মক অপরাধ, তার উপর এই দীর্ঘ গড়নটা যেন তাকেও ডিঙ্গিয়ে গিয়েছিল। অন্ততঃ সে রাতটার জন্তও যদি আমাকে কোন রকমে মুচড়ে মাচড়ে একটু খাটো ক’রে তুলতে পারতেন, মা বোধ করি তাতেও পেছুতেন না। কিন্তু সে তো হবার নয়। আমি আমাক স্বামীর বুক ছাড়িয়ে একেবারে দাড়ির কাছে গিয়ে পৌঁছলুম।

কিন্তু শুভদৃষ্টি হ’ল না, আমি ঠিক রাগে নয়, কেমন যেন একটা বিতৃষ্ণার চোখ বুজে রইলুম। কিন্তু তাও বলি, এমন কোন অসহ বর্মান্তিক হুঃখও তখন আমি মনের মধ্যে পাইনি!

ইতিপূর্ব্বে কত দিন সারা রাত্রি জেগে জেগে ভেবেছি, এমন হৃদয়না

যদি সত্যিই কপালে ঘটে, নরেন এসে আমাকে না নিয়ে যায়, তবু আর কারও সঙ্গে আমার বিয়ে কোন মতেই হ'তে পারবে না। সে রাজে নিশ্চয় আমার বুক চিরে ভলকে ভলকে রক্ত মুখ দিয়ে গড়িয়ে পড়বে, ধরাধরি ক'রে আমাকে বিবাহ-সভা থেকে বিছানায় তুলে নিয়ে যেতে হবে, এ বিশ্বাস আমার মনে একেবারে বদ্ধমূল হয়েছিল। কিন্তু কৈ কিছুই ত হ'ল না। আরও পাঁচজন বান্ধালীর মেয়ের যৈমন হয় শুভকর্ম তেমনি ক'রে আমারও সমাধা হয়ে গেল, এবং তেমনি ক'রেই একদিন স্বপ্তরবাড়ী যাত্রা কম্বলুম।

শুধু যাবার সময়টিতে পাক্কীর কাঁক দিয়ে সেই কাঁটালি-চাপার কুঞ্জ-টায় চোখ পড়ায় হঠাৎ চোখে জল এল। সে যে আমাদের কত দিনের কত চোখের জল, কত দিবিয়-দিলাশার নীরব-সাক্ষী।

আমার চিতোর গ্রামের সম্বন্ধটা যে দিন পাকা হ'য়ে গেল, ওই গাছটার আড়ালে বসেই অনেক অশ্রু-বিনিময়ের পর স্থির হয়েছিল, সে এসে একদিন আমাকে নিয়ে চলে যাবে। কেন, কোথায় প্রভৃতি বাহ্যিক প্রেরণের তখন আবশ্যক হয় নি।

আর কিছু না, শুধু যাবার সময় একবার যদি দেখা হ'ত!—কেন সে আমাকে আর চাইলে না, কেন আর একটা দিনও দেখা দিলে না—শুধু যদি খবরটা পেতুম।

৬ স্বপ্তরবাড়ী গেলুম, বিয়ের বাকি অনুষ্ঠানও শেষ হ'য়ে গেল। অর্থাৎ আমি আমার স্বামীর ধর্মপত্নীর পদে এইবার পূর্ণা হয়ে বসলুম।

দেখলুম, স্বামীর প্রতি বিতৃষ্ণা শুধু একা আমার নয়। বাড়ীশুদ্ধ আমার দলে। স্বপ্তর নেই, সং-শাশুড়ী, তার নিজের ছেলে দু'টি, একটি বউ এবং বিধবা মেয়েটি নিয়েই ব্যতিব্যস্ত! এতদিন নিরাপদে সংসার করছিলেন, হঠাৎ একটা সতেরো আঠারো বছরের মন্ত বোঁ দেখে তাঁর সমস্ত মন সশস্ত্র জেগে উঠল। কিন্তু মুখে বললেন, “বাঁচলুম বোঁমা, তোমার

হাতে সংসার ফেলে দিয়ে এখন হৃদয় ঠাকুরদের নাম করতে পাবো। ঘনশ্রাম আমার পেটের ছেলের চেয়েও বেশি ; সে বেঁচে থাকলেই তবে সব বজায় থাকবে, এইটি বুঝে শুধু কাজ করো মা, আর কিছু আমি চাইনে।”

তার কাজ তিনি করবেন, আমার কাজ আমি করলুম, বললুম, “আচ্ছা।” কিন্তু সে ওই কুস্তিগীরের তাল ঠোকার মত। পাঁচ মার্তে যে হুজনেই জানি, তা ইসারায় জানিয়ে দেওয়া।

কিন্তু কত শীঘ্র মেয়েমানুষ যে মেয়েমানুষকে চিনতে পারে, এ এক আশ্চর্য্য ব্যাপার। তাঁকে জানতে আমারও যেমন দেরি হোল না, আমাকেও হৃদনের মধ্যে চিনে নিয়ে তিনিও তেমনি আরামের নিশ্বাস ফেললেন। বৈশ বুললেন, স্বামীর খাওয়া-পরা, ওঠা-বসা, খরচপত্র নিয়ে দিবারাত্র চক্র ধরে ফৌস-ফৌস করে বেড়াবার মত আমার উৎসাহও নেই, প্ররুতিও নেই।

মেয়েমানুষের তুণে যত প্রকার দিব্যাস্ত্র আছে, “আড়ি পাতাটা” ব্রহ্মাস্ত্র। সুবিধা পেলে এতে মা-মেয়ে, শাশুড়ী-বৌ, জা-ননদ, কেউ কাকে খাতির করে না। আমি ঠিক জানি, আমি যে পালঙ্কে না শুয়ে ঘরের মেঝেতে একটা মাহুর টেনে নিয়ে সারাশ্রাত্রি পড়ে থাকতুম, এ অসংবাদ তাঁর অগোচর ছিল না। আগে যে ভেবেছিলুম, নরেনের বদলে আর কারো ঘর করতে হ’লে সেই দিনই আমার বুক ফেটে যাবে, দেখলুম, সেটা ভুল। ফাটবার চেতবার কোন লক্ষণই টের পেলুম না। কিন্তু তাই ব’লে একশয্যায় শুতেও আমার কিছুতেই প্ররুতি হ’লো না।

দেখলুম, আমার স্বামীটি অদ্ভুত প্রকৃতির লোক। আমার আচরণ নিয়ে তিনি কিছুদিন পর্য্যন্ত কোন কথাই কইলেন না। অথচ মনে মনে রাগ কিংবা অভিমান করে আছেন, তাও না। শুধু একদিন একটু হেসে বুললেন, “ঘরে আর একটা খাট এনে বিছানাটা বড় করে নিলে কি শুতে পার না ?”

আমি বল্‌লুম, “দরকার কি, আমার ত কষ্ট হয় না।”

তিনি বল্‌লেন, “না হ’লেও একদিন অসুখ ক’রতে পারে যে।”

আমি বল্‌লুম, “তোমার এতই যদি ভয়, আমার আর কোন ঘরে শোবার ব্যবস্থা ক’রে দিতে পার না?”

তিনি বল্‌লেন, “ছিঃ, তা কি হয়? তাতে কত রকমের অপ্রিয় আলোচনা উঠবে।”

বল্‌লুম, “ওঠে উঠুক, আমি গ্রাহ্য করি নে।”

তিনি একমুহূর্ত চুপ করে আমার মুখের পানে চেয়ে থেকে বল্‌লেন, “এত বড় বুকের পাটা যে তোমার চিরকাল থাকবে, এমন কি কথা আছে?” বলে একটুখানি হেসে কাজে চ’লে গেলেন।

আমার মেজ-দেওর টাকা চল্লিশের মত কোথায় চাকরী করতেন ; কিন্তু একটা পয়সা কখন সংসারে দিতেন না। অথচ, তাঁর আফিসের সময়ের ভাত, আফিস থেকে এলে পা ধোবার গাড়ু-গামছা, জল-খাবার, পান তামাক ইত্যাদি যোগাবার জন্তে বাড়ী শুদ্ধ সবাই যেন ব্রহ্ম হয়ে থাকত। দেখ্‌চুম, আমার স্বামী আর আমার মেজ-দেওর হয় ত কোন দিন একসঙ্গেই বিকেলবেলায়, বাড়ী ফিরে এলেন, সবাই তাঁর জন্তেই ব্যতিব্যস্ত ; এমন কি চাকরটা পর্য্যন্ত তাঁকে প্রসন্ন করবার জন্তে ছুটোছুটি ক’রে বেড়াচ্ছে। তাঁর একতিল দেরী কিংবা অসুবিধা হ’লে যেন পৃথিবী রহাতলে যাবে। অথচ আমার স্বামীর দিকে কেউ চেয়েও দেখ্‌ত না। তিনি আশ্চর্য্যটা ধ’রে হয় ত এক ঘটা জলের জন্ত দাঁড়িয়ে আছেন—কারও সে দিকে গ্রাহ্যই নেই। অথচ এদের খাওয়া-পরা সুখ-সুবিধের জন্তেই তিনি দিবা-রাত্রি খেতে মরুচেন। ছ্যাকরা গাড়ীর ঘোড়াও মাঝে মাঝে বিদ্রোহ করে, কিন্তু, তাঁর যেন কিছুতেই শাস্তি নেই, কোন দুঃখই যেন তাঁকে পীড়া দিতে পারে না। এমন শাস্ত, এত ধীর,—এত পরিশ্রমী, এর আগে কখনও আমি চোখে দেখিনি। আর চোখে দেখেছি ব’লেই

লিখতে পারুচি, নইলে শোনা কথা হ'লে কিমান কর্তেই পারতুম না, সংসারে এমন ভাল মানুষও থাকতে পারে। যুদ্ধে হাসিটি লেগেই আছে। সব তাতেই বলতেন, “থাক্ থাক্, আমার এতেই হবে।”

স্বামীর প্রতি আমার মায়াই ত ছিল না, বরঞ্চ বিতৃষ্ণার ভাবই ছিল। তবু এমন একটা নিরীহ লোকের উপর বাড়ীশুদ্ধ সকলের এত বড় অত্যাচার-অবহেলায় আমার গা যেন জলে যেতে লাগলো।

বাড়ীতে গরুর দুধ বড় কম হ'ত না। কিন্তু তাঁর পাতে কোন দিন বা একটু পড়ত। কোন দিন পড়ত না। হঠাৎ একদিন সইতে না পেরে ব'লে ফেলোছিলুম আর কি! কিন্তু পরক্ষণেই মনে হ'ল, ছি, ছি, কি নিলজ্জাই আমাকে তা হ'লে এরা মনে করত। তা ছাড়া এরা সব আপনার লোক হয়েও যদি দয়া-মায়ী না করে, আমারই বা এত মাথা-ব্যথা কেন? আমি কোথাকার কে? পর বই ত না।

দিন-পাঁচ-ছয় পরে একদিন সকালবেলা রান্নাঘরে ব'লে মেজ-ঠাকুর-পোর জন্তে চা তৈরি করুচি, স্বামীর কণ্ঠস্বর আমার কাণে গেল। তাঁর সকালেই কোথায় বা'র হবার দরকার ছিল, ফিরতে দেরি হবে, মাকে ডেকে বললেন, “কিছু খেয়ে গেলে রুড় ভাল হ'ত, মা, খাবার-টাবার কিছু আছে?”

মা বললেন, “অবাক্ করলে ঘনশ্রাম! এত সকালে খাবার পাব কোথায়?”

স্বামী বললেন, “তবে থাক্, ফিরে এসেই খাবো।” ব'লে চ'লে গেলেন।

সেদিন আমি কিছুতেই আপনাকে আর সামলাতে পারলুম না। আমি জানতুম, ও-পাড়ার বোসেরা তাদের বেয়াই-বাড়ীর পাওয়া লক্ষ্যে রসগোল্লা পাড়ায় বিলিয়েছিল। কাল রাতে আমাদেরও কিছু দিয়েছিল।

শাশুড়ী ঘরে ঢুকতেই ব'লে ফেললুম, “কালকের খাবার কি কিছুই ছিল না মা ?”

তিনি একেবারে আকাশ থেকে প'ড়ে বসলেন, “খাবার আবার কে কিনে আনলে বউ-মা ?”

বললুম, “সেই যে বোসেরা দিয়ে গিয়েছিল ?”

তিনি বললেন, “ও মা, সে আবার ক'টা যে, আজ সকাল পর্যন্ত থাকবে ? সে ত কাণই শেষ হয়ে গেছে।”

বললুম, “তা ঘরেই কি কিছু খাবার তৈরী ক'রে দেওয়া যেত না মা ?”

শাশুড়ী বললেন, “বেশ ত বোমা, তাই কেন দিলে না ? তুমি ত ব'সে ব'সে সমস্ত গুন্টিলে বাছা ?”

চুপ ক'রে রইলুম। আমার কি-ই বা বলবার ছিল। স্বামীর প্রতি আমার ভালবাসার টান ত আর বাড়ীতে কারো অবিদিত ছিল না।

চুপ ক'রে রইলুম সত্যি, কিন্তু ভেতরে মনটা আমার জলতেই লাগল। ছপুরবেলা শাশুড়ী ডেকে বললেন, “খাব এস বউ-মা, ভাত বাড়ি হয়েছে।”

বললুম, “আমি এখন খাব না মা, তোমরা খাও গে।”

আমার আঙ্গকের মনের ভাব শাশুড়ী লক্ষ্য করছিলেন, বললেন, “ধাবে না, কেন শুনি ?”

বললুম, “এখন ক্ষিদে নেই।”

আমার মেজাজ আমার চেয়ে বছর চারেকের বড় ছিলেন। রান্না-ঘরের ভেতর থেকে ঠোকর দিয়ে ব'লে উঠলেন, “বটঠাকুরের খাওয়া না হ'লে বোধ হয় দিদির ক্ষিদে হবে না মা।”

শাশুড়ী বললেন, “তাই না কি বউ-মা ? বলি, এ নূতন চঙ শিখলে কোথায় ?”

তিনি কিছু মিথ্যে বলেন নি, আমার পক্ষে এ ঢঙই বটে, তবু খোঁটা সহিতে পার্‌লুম না, জবাব দিয়ে বস্‌লুম, “নূতন হবে কেন মা, তোমাদের সময়ে কি এ রীতির চলন ছিল না ? ঠাকুরদের খাবার আগেই কি খেতে ?”

“তবু ভালো, ঘনশ্রামের ঐতদিনে কপাল ফির্‌ল” ব’লে শাশুড়ী মুখখানা বিকৃত ক’রে রান্নাঘরে গিয়ে ঢুকলেন।

মেজ-জায়ের গলা কাণে গেল। তিনি আমাকে শুনিয়েই বললেন, “তখনি ত বলেছিলুম মা ! বুড়ো শালিক পোষ মান্‌বে না।”

রাগ ক’রে ঘরে এসে শুয়ে পড়লুম বটে, কিন্তু এইবার সমস্ত জিনিসটা মনে মনে আলোচনা ক’রে লজ্জায় যেন মাথা কাটা যেতে লাগল। কেবলই মনে হ’তে লাগল, তাঁর খাওয়া হয় নি ব’লে খাইনি, তাঁর কথা নিয়ে ঝগড়া করেছি, ফিরে এসে, এ সব যদি তাঁর কাণে যায় ? ছি ছি ! কি ভাববেন তিনি ! আমার এতদিনের আচরণের সঙ্গে এ ব্যবহার এমনি বিসদৃশ, খাপছাড়া যে, নিজের লজ্জাতেই নিজেকে ম’রে যেতে লাগলুম।

কিন্তু বাঁচলুম, ফিরে এলে এ কথা কেউ তাঁকে শোনাতে না।

সত্যিই বাঁচলুম, এর এক বিন্দু মিছে নয়। কিন্তু আচ্ছা—একটা কথা যদি বলি, তোমরা বিশ্বাস করতে পার্‌বে কি ? যদি বলি, সে রাত্রে পরিশ্রান্ত স্বামী শয়্যার উপর ঘুমিয়ে রইলেন, আর নীচে যতক্ষণ না আমার ঘুম এল, ততক্ষণ ফিরে ফিরে কেবলই সাথ হ’তে লাগল, কেউ যদি কথাটা ওঁর কাণে তুলে দিত, অভুক্ত স্বামীকে ফেলে আজ আমি কিছুতে খাইনি, এই নিয়ে ঝগড়া করেছি, তবু মুখ বুজে এ অজ্ঞায় সহ্য করিনি—কথাটা তোমাদের বিশ্বাস হবে কি ? না হ’লে তোমাদের দোষ দেব না, হ’লে বহু ভাগ্য বলে মান্‌ব। আজ আমার স্বামীর বড় ত ব্রহ্মাণ্ডে আর কিছুই নেই, তাঁর নাম নিয়ে বল্‌চি, মানুষের মন-পদার্থ-টার

যে অন্ত নেই, সেই দিন তার আভাষ পেয়েছিলুম। এত বড় পাপিষ্ঠার মনের মধ্যেও এমন ছুঁটো উন্টো স্রোত একসঙ্গে ব'য়ে যাবার স্থান হ'তে পারে দেখে, তখন অবাক হয়ে গিয়েছিলুম !

মনে মনে বলতে লাগলুম, এ যে বড় লজ্জার কথা ! নইলে এখুনি ঘুম থেকে জাগিয়ে ব'লে দিতুম, শুধু স্টিছাড়া ভালোমানুষ হ'লেই হয় না, কর্তব্য করতে শেখাও দরকার। যে স্ত্রী তুমি একবিন্দু ধবর নাও না, সে তোমার জ্ঞা কি করেছে, একবার চোখ মেলে দেখ। হা রে পোড়া কপাল ! খতোং চায় সূর্য্যদেবকে আলো ধ'রে পথ দেখাতে। তাই বলি, হতভাগীর স্পর্ধার কি আর আদি-অন্ত দাওনি ভগবান !

গরমের জ্ঞা কি না বলতে পারিনে, ক'দিন ধ'রে প্রায়ই মাথা ধরছিল ! দিন-পাঁচেক পরে অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত ছট্‌ফট্‌ ক'রে কখন একটু ঘুমিয়ে পড়েছিলুম। ঘুমের মধ্যেই যেন মনে হচ্ছিল, কে পাশে ব'সে ধীরে ধীরে পাখার বাতাস করছে। একবার ঠক্‌ ক'রে গায়ে পাখাটা ঠেকে যেতে ঘুম ভেঙে গেল। ঘরে আলো জল্‌ছিল, চেয়ে দেখলুম স্বামী !

রাত জেগে ব'সে পাখার বাতাস ক'রে আমাকে ঘুম পাড়াচ্ছেন !

হাত দিয়ে পাখাটা ধ'রে ফেল বললুম, “এ তুমি কি কর্চ !”

তিনি বললেন, “কথা কইতে হবে না, ঘুমোও, জেগে থাকলে মাথাধরা ছাড়বে না।”

আমি বললুম, “আমার মাথা ধ'রেছে, কে তোমাকে বললে ?”

তিনি একটু হেসে জবাব দিলেন, “কেউ নলেনি ; আমি হাত গুণ্ডে জানি। কারো মাথা ধ'রলেই টের পাই।”

বললুম, “তা হ'লে ত অল্প দিনও পেয়েছ বল ? মাথা ত শুধু আমার আজই ধরেনি।”

তিনি আবার একটু হেসে বললেন, “রোজই পেয়েছি। কিন্তু এখন একটু ঘুমোবে, না, কথা কবে ?”

বল্লুম, “মাথাধরা আমার ছেড়ে গেছে, আর ঘুমোবো না।”

তিনি বল্লেন, “তবে সবুর কর, ওষুধটা তোমার কপালে লাগিয়ে দিই,” বলে উঠে গিয়ে কি একটা নিয়ে এসে ধীরে ধীরে আমার কপালে ধ’বে দিতে লাগলেন! আমি ঠিক ইচ্ছে ক’রেই যে কর্লুম, তা নয়, কিন্তু আমার ডান-হাতটা কেমন ক’রে তাঁর কোলের ওপর গিয়ে পড়তেই তিনি একটা হাত দিয়ে সেটা চেপে ধ’রে রাখলেন। হয় ত একবার একটু জোর ক’রেও ছিঁলুম। কিন্তু জোর আপনিই কোথায় মিলিয়ে গেল। দূরন্ত এছলেকে মা যখন কোলে টেনে নিয়ে জোর ক’রে ধ’রে রাখেন, তখন, বাইরে থেকে হয় ত সেটাকে একটুখানি অত্যাচারের মতও দেখায়, কিন্তু সে অত্যাচারের মধ্যে শিশুর ঘুমিয়ে পড়তে বাধে না।

বাইরের লোক যাই বলুক, শিশু বোঝে, ওইটেই তার সব চেয়ে নিরাপদ স্থান। আমার এই জড়পিণ্ড হাতটারও বোধ করি সেই জ্ঞানই ছিল, নইলে কি কোরে সে টের পেলে, নিশ্চিন্ত-নির্ভরে প’ড়ে থাকবার এমন আশ্রয় তার আর নেই।

তার পর তিনি আস্তে আস্তে আমার কপালে হাত বুলাতে লাগলেন, আমি চুপ ক’রে প’ড়ে রইলুম। আমি এর বেশি আর বোলব না। আমার সেই প্রথম রাজির আনন্দ-স্বস্তি—সে আমার, একেবারে আমারই থাক্।

কিন্তু আমি ত জান্‌তুম, ভালবাসার যা কিছু, সে আমি শিখে এবং শেব ক’রে দিয়ে ঋণুরবাড়ী এসেছি। কিন্তু সে শেখা যে ডাঙায় হাত-পা ছুঁড়ে সাঁতার শেখার মত ভুল-শেখা, এই সোজা কথাটা সেদিন যদি টের পেতাম! স্বামীর কোলের ওপর থেকে আমার হাতখানা যে তার সর্ব্বাঙ্গ দিয়ে শোষণ ক’রে এই কথাটাই আমার বুকের ভেতর পৌঁছে দেবার চেষ্টা করছিল, এই কথাটাই যদি সেদিন আমার কাছে ধরা পড়ত!

সকালে ঘুম ভেঙ্গে দেখলুম, স্বামী ঘরে নেই, কখন উঠে গেছেন। হঠাৎ মনে হ'ল, স্বপন দেখিনি ত ? কিন্তু চেয়ে দেখি, সেই ওয়ুথের শিশিটা তখনও শিয়রের কাছে রয়েছে। কি যেন মনে হ'ল, সেটা বার বার মাথায় ঠেকিয়ে তবে কুলুঙ্গিতে রেখে বাইরে এলুম।

শাশুড়ী-ঠাকরুণ সেই দিন থেকে আমার ওপব যে কড়া নজর রাখছিলেন, সে আমি টের পেতুম। আমিও ভেবেছিলুম, মরুক গে, আমি কোন কথায় আর থাকব না। তা'ছাড়া দু'দিন আসতে না আসতে স্বামীর খাওয়া-পরা নিয়ে ঝগড়া,—ছি ছি, লোকে শুনলেই বা বলবে কি ?

কিন্তু কবে যে এর মধ্যেই আমার মনের ওপর দাগ প'ড়ে গিয়েছিল, কবে যে তাঁর খাওয়া-পরা নিয়ে ভিতরে ভিতরে উৎসুক হ'য়ে উঠেছিলুম, সে আমি নিজেই জানতুম না। তাই, দু'টো দিন যেতে-না-যেতেই আবার একদিন ঝগড়া ক'রে ফেললুম।

আমার স্বামীর কে একজন আড়ৎদার বন্ধু সেদিন সকালে মস্ত একটা রুইমাছ পাঠিয়েছিলেন। স্নান করতে পুকুরে যাচ্ছি, দেখি, বারান্দার ওপর সবাই জড় হয়ে কথাবার্তা হচ্ছে। কাছে এসে দাঁড়ালুম, মাছ কোটা হয়ে গেছে। মেজ-জা তরকারী কুট্‌চেন, শাশুড়ী ব'লে ব'লে দিচ্ছেন ;—এটা মাছের ঝালের কুট্‌নো,—ওটা মাছের ডালনার কুট্‌নো ওটা মাছের অঙ্কলের কুট্‌নো, এমনি সমস্তই প্রায় আসরান্না। আজ একাদশী—তাঁর এবং বিধবা মেয়ের খাবার হাঁজামা নেই, কিন্তু আমার স্বামীর জন্য কোন ব্যবস্থাই দেখলুম না। তিনি বৈক্য-মাসুখ, মাছ মাংস ছুঁতেন না। একটু ডা'ল, দু'টো ভাজাভুজি, একটুখানি অঙ্কল হ'লেই তাঁর খাওয়া হ'ত। অথচ, ভাল খেতেও তিনি ভালবাসতেন। এক-আধ দিন একটু ভাল তরকারি হ'লে তাঁর আজ্ঞাদের সীমা থাকত না, তাও দেখেছি।

বল্লুম, “ওঁর জন্তে কি হ’চ্ছে মা ?”

শান্তাডী বললেন, “আজ আর সময় কৈ বউ-মা ? তার জন্তে দু’টো আলু-উচ্ছে ভাতে দিতে ব’লে দিয়েছি—তার পর একটু দুধ দেব’ধন ।”

বল্লুম,—“সময় নেই কেন মা ?”

শান্তাডী বিরক্ত হয়ে বললেন, “দেখতেই ত পাচ্ছ বউ-মা । এতগুলো আঁস-রান্না হ’তেই ত দশটা—এগারটা বেজে যাবে । আজ আমার অধিলের (মেজ-দেবর) ‘দু’চার জন বন্ধু-বান্ধব খাবে, তারা হ’ল সব অপিসার মানুষ, দশটার মধ্যে খাওয়া না হ’লে পিস্তি প’ড়ে সারাদিন আর খাওয়াই হবে না । এর ওপর আবার নিরিমিষ রান্না করতে গেলে ত রাঁধুনী বাঁচে না । তার প্রাণটাও ত দেখতে হবে বাছা !”

রাগে সর্কাজ রি-রি ক’রে জ্বলতে লাগল । তবু কোনমতে আত্ম-সংবরণ ক’রে বল্লুম, “শুধু আলু-উচ্ছে-ভাতে দিয়ে কি কেউ খেতে পারে মা ? একটুখানি ডাল রাঁধবারও কি সময় হ’ত না ?”

তিনি আমার মুখপানে কটমট ক’রে চেয়ে বললেন, “তোমার সঙ্গে তর্ক করতে পারিনে বাছা, আমার কাজ আছে ।”

এতক্ষণ রাগ সামলেছিলুম, আর পার্লুম না । ব’লে ফেল্লুম, “কাজ সকলেরি আছে মা ! তিনি তিরিশ টাকার কেরাগী-গিরি করেন না ব’লে কুলি-মজুর ব’লে তোমরা তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করতে পারো । কিন্তু আমি ত পারিনে ! আমি ওই দিয়ে তাঁকে খেতে দেব না । রাঁধুনী রাঁধতে না পারে, আমি যাচ্ছি ।”

শান্তাডী ধানিকর্ষণ অবাক হ’য়ে আমার পানে চেয়ে থেকে বললেন, “তুমি ত কা’ল এলে বউ-মা, এতদিন তার কি ক’রে খাওয়া হ’ত শুনি ?”

বল্লুম, “সে খোঁজে আমার দরকার নেই । কিন্তু কা’ল এলেও আমি কচি খুঁকি নই মা । এখন থেকে সে সব হ’তে দিতে পারব না ।”
রান্না-বয়ে ঢুকে রাঁধুনীকে বল্লুম, “বড়বাবুর জন্ত নিরামিষ ডাল-ডালনা,

অবল হবে। তুমি না পারো, একটা উল্লু ছেঁড় দাও, আমি এসে রাঁধুঁচি”, ব’লে আর কোন তর্কাতর্কির অপেক্ষা না ক’রে স্নান করতে চ’লে গেলুম।

স্বামীর বিছানা আমি রোজ নিজের হাতেই করতুম। এই ধপ্পে শাদা বিছানাটির উপর ভেতরে ভেতরে আমার যে একটা লোভ জন্মাচ্ছিল, হঠাৎ এত দিনের পর আজ বিছানা করবার সময় সে কথা জানতে পেরে, নিজের কাঁছেই যেন লজ্জায় ম’রে গেলুম।

ঘড়িতে বারোটা বাজতে তিনি শুতে এলেন। কেন’ যে এত রাত পর্যন্ত জেগে ব’সে বই পড়ছিলাম, তাঁর পায়ের শব্দ সে খবর আজ এমনি স্পষ্ট ক’রে আমার কাণে কাণে ব’লে দিলে যে, লজ্জায় মুখ তুলে চাইতেও পারলুম না।

স্বামী বললেন, “এখনো শোওনি যে?”

আমি বই থেকে মুখ তুলে ঘড়ীর পানে তাকিয়ে যেন চমকে উঠলুম — “তাই ত, বারোটা বেজে গেছে!”

কিন্তু, যিনি সব দেখতে পান, তিনি দেখেছিলেন, আমি পাঁচ মিনিট অন্তর ঘড়ী দেখেছি।

স্বামী শয্যায় ব’সে একটু হেসে বললেন, “আজ আবার কি হাকামা বাধিয়েছিলে?”

বললুম, “কে বললে?”

তিনি বললেন, “সেদিন তোমাকে ত বলেছি, আমি হাত গুণতে জানি।”

বললুম, “জানলে-ভালই! কিন্তু, তোমার গোয়েন্দার নাম না বল, তিনি কি কি দোষ আমার দিলেন শুনি?”

তিনি বললেন, “গোয়েন্দা দোষ দেয়নি, কিন্তু আমি দিচ্ছি। আচ্ছা জিজ্ঞেস করি, এত অল্পে তোমার এত রাগ হয় কেন?”

বল্লুম, “অল্ল ? তুমি কি ভাবো, তোমাদের জ্ঞান-অজ্ঞানের বাটখারা দিয়েই সকলের ওজন চলবে ? কিন্তু তা’ও ব’লছি, তুমি যে এত বলচ, এ অত্যাচার চোখে দেখলে তোমারও রাগ হ’ত।”

তিনি আবার একটু হাসলেন, বললেন, “আমি বোষ্টম, আমার ত নিজের উপর অত্যাচারে রাগ কবতে নেই। মহাপ্রভু আমাদের গাছের মত সহিষ্ণু হ’তে বলেছেন, আর তোমাকে এখন থেকে তাই হ’তে হবে।”

“কেন আমার অপরাধ ?”

“বৈষ্ণবের জ্ঞী, এই মাত্র তোমার অপরাধ।”

বল্লুম, “তা হ’তে পারে, কিন্তু, গাছের মত অজ্ঞায় সহ্য করা আমার কাজ নয়, তা সে যে প্রভুই আদেশ করুন। তা ছাড়া, যে লোক ভগবান্ পর্য্যন্ত মানে না, তার কাছে আবার মহাপ্রভু কি ?”

স্বামী হঠাৎ যেন চমকে উঠলেন, বললেন, “কে ভগবান্ মানে না ? তুমি ?”

বল্লুম, “হাঁ আমি।”

তিনি বললেন, “ভগবান্ মান না কেন ?”

বল্লুম, “নেই ব’লে মানিনে। মিথ্যে ব’লে মানিনে।”

আমি লক্ষ্য ক’রে দেখছিলাম, আবার স্বামীর হাসি মুখখানি ধীরে ধীরে স্তান হ’য়ে আসছিল, এই কথার পর সে মুখ একেবারে যেন ছাইয়ের মত শাদা হয়ে গেল। একটুখানি চুপ করে থেকে বললে, “তুনেছিলুম তোমার মায়ী নাকি নিজেকে নাস্তিক বলতেন—”

আমি মাঝখানেই ভুল শুধরে দিয়ে বল্লুম,—“না, তিনি নিজেকে নাস্তিক বলতেন না, “Agnostic বলতেন—”

স্বামী বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, “সে আবার কি ?”

আমি বল্লুম, “Agnostic তারা, যারা ঈশ্বর আছেন বা নেই—কোন কথাই বলে না।”

কথাটা শেষ না হ'তেই স্বামী ব'লে উঠলেন, “থাক, এ সব আলোচনা। আমার সামনে তুমি কোন দিন আর এ কথা মুখে এনো না।”

তবু তর্ক করতে যাচ্ছিলুম, কিন্তু, হঠাৎ তাঁর মুখপানে চেয়ে আর আমার মুখে কথা যোগাল 'না। ভগবানের ওপর তাঁর অচল বিশ্বাস আমি জানতুম, কিন্তু কোন মানুষ যে আর একজনের মুখ থেকে তাঁর অস্বীকার শুনলে এত ব্যথা পেতে পারে, এ ধারণাই আমার ছিল না। এই নিয়ে আমার বসবার ঘরে অনেক তর্ক নিজেও কর্কেচি, অপরকেও করতে শুনেছি, রাগারাগি হ'য়ে যেতে বহুবার দেখেচি, কিন্তু এমন বেদনায় বিবর্ণ হ'য়ে যেতে কাউকে দেখিনি। আমি নিজেও ব্যথা বড় কম পেলুম না, কোন তর্ক না ক'রে এ ভাবে আমার মুখ বন্ধ ক'রে দেওয়ায় অপমানে আমার মাথা হেঁট হ'য়ে গেল। কিন্তু ভাবি, আমার অপমানের পালাটা এর ওপর দিয়েই কেন সেদিন শেষ হ'ল না।

যে মাহুরটা পেতে আমি নীচে শুতুম, সেটা ঘরের কোণে গুটানো থাকত; আজ কে সরিয়ে রেখেছিল, বলতে পারিনি। খুঁজে পাচ্ছিলে দেখে, তিনি নিজে বিছানা থেকে একটা তোবক তুলে বললেন, “আজ এইটে পেতে শোও! এত রাত্রে কোথা আর খুঁজে বেড়াবে বল।”

তাঁর কঠিন স্বরে বিক্রম-ব্যক্তির লেশমাত্র ছিল না। তবুও কথাটা যেন অপমানের শূল হ'য়ে আমার বুকে বিঁধিল। রোজ ত আমি নীচে শুই। সামান্য একখানা মাহুর পেতে যেমন তেমন ভাবে রাত্রি যাপন করাটাই ত ছিল আমার সব চেয়ে বড় গর্ব। কিন্তু স্বামীর ছোট্ট ছুটি কথায় যে আজ আমার সেই গর্ব ঠিক তত বড় লাজনায় রূপান্তরিত হ'য়ে দেখা দেবে, এ কে ভেবেছিল?

অন্তরে শোবার উপকরণ স্বামীর হাত থেকেই হাত পেতে নিলুম, কিন্তু শোবামাত্রই কান্নার ঢেউ যেন আমার গলা পর্যন্ত কেনিয়ে উঠল।

জানিনে তিনি শুনতে পেয়েছিলেন কি না। সকাল হ'তে না হ'তেই তাড়াতাড়ি বিছানা তুলে ঘর থেকে পালাবার চেষ্টা কর্চি, তিনি ডেকে বললেন, “আজ এত ভোরে উঠলে যে ?”

বল্লুম, “ঘুম ভেঙ্গে গেল, তাই বাইরে যাচ্ছি।”

বললেন, “একটা কথা আশার শুনবে ?”

রাগে-অভিমানে সর্ব্বাক্ষ ভ'রে গেল, বল্লুম, “তোমার কথা কি আমি শুনিনি ?”

আমার মুখপানে চেয়ে তিনি একটু হেসে বললেন, “শোন ; আচ্ছা, তাহ'লে কাছে এস, বলি।”

বল্লুম, “আমি ত কালা নই, এখানে দাঁড়িয়েই শুনতে পাব।”

“পাবে না গো, পাবে না,” বলেই তিনি হঠাৎ স্মৃখে বুক পড়ে আমার হাতটা ধরে ফেললেন। আমি জোর ক'রে ছাড়াতে গেলাম, কিন্তু, তাঁর সঙ্গে পারব কেন, একেবারে বকের কাছে টেনে নিয়ে হাত দিয়ে জোর ক'রে আমার মুখ তুলে ধ'রে বললেন, “যারা ভগবান্ মানে তারা কি বলে জানো ? তারা বলে, স্বামীর কাছে কিছুতেই মিথ্যে বলতে নেই।”

আমি বল্লুম, “কিন্তু যারা ভগবান্ মানে না, তারা বলে, কারও কাছেই মিথ্যে বলতে নেই।”

স্বামী হেসে বললেন, “বটে ! কিন্তু তাই যদি হয়, অতবড় মিথ্যে কথাটা কাল কি ক'রে মুখে আনলে বলত ? কি ক'রে বললে ভগবান্ ভুঁমি মানো না ?”

হঠাৎ মনে হ'ল, এত আশা ক'রে বুঝি কেউ কখনো কারও সঙ্গে কথা কয়নি। তাই বলতে মুখে বাধতে লাগল, কিন্তু তবু ত পোড়া অহঙ্কার গেল না, ব'লে ফেল্লুম “ভগবান্ মানি বললেই বুঝি সত্যি কথা বলা হ'ত ? আমাকে আটকে রাখলে কেন ? আর কোন কথা আছে ?”

তিনি স্নানমুখে আস্তে আস্তে বললেন, “আর একটা কথা—মায়ের কাছে আজ মাপ চেয়ো।”

আমার সর্বাঙ্গ রাগে জ্বলে উঠলো ; বললুম, “মাপ চাওয়াটা কি ছেলেখেলা, না, তার কোন অর্থ আছে ?”

স্বামী বললেন, “অর্থ তার এই যে, সৈটা তোমার কর্তব্য।”

বললুম, “তোমাদের ভগবান্ বুদ্ধি বলেন, যে নিরপরাধ, সে গিয়ে অপরাধীর নিকট ক্ষমা চেয়ে কর্তব্য করুক ?”

স্বামী আমাকে ছেড়ে দিয়ে আমার মুখের পাত্রে ধানিকঙ্কণ চূপ ক’রে চেয়ে রইলেন। তার পর ধীরে ধীরে বললেন, “ভগবানের নাম নিয়ে তামাসা করতে নেই, এ কথা ভবিষ্যতে কোন দিন আর যেন মনে ক’রে দিতে আমায় না হয়। আমি তর্ক করতে ভালবাসিনে—মায়ের কাছে মাপ চাইতে না পারো, তাঁর সঙ্গে আর কখনও বিবাদ করতে যেয়ো না।”

বললুম, “কেন, শুন্তে পাইনে ?”

তিনি বললেন, “না। নিষেধ করা আমার কর্তব্য, তাই নিষেধ করে দিলুম।” এই বলে তিনি বাহিরে যাবার জন্ত উঠে দাঁড়ালেন। আমি আর সইতে পারলুম না, বললুম, “কর্তব্যজ্ঞানটা তোমাদেরই যদি এত বেশি, সে কি আর কারও নেই ? আমিও ত মানুষ, বাড়ীর মধ্যে আমারও ত একটা কর্তব্য আছে। তা যদি তোমাদের ভাল না লাগে, আমাকে বাপের বাড়ী পাঠিয়ে দাও। থাকলেই বিবাদ হবে, এ নিশ্চয় বলে দিচ্ছি।”

তিনি ফিরে দাঁড়িয়ে বললেন, “তাহ’লে গুরুজনের সঙ্গে বিবাদ করাই বুদ্ধি তোমার কর্তব্য ? সে যদি হয়, যেদিন ইচ্ছে বাপের বাড়ী যাও, আমাদের কোন আপত্তি নেই।”

স্বামী চলে গেলেন, আমি সেইখানে থপ্ ক’রে বসে পড়লুম।

মুখ দিয়ে শুধু আমার বাক্য হ'ল, “হায় রে ! যার জন্ত চুরি করি সেই বলে চোর !”

সমস্ত সকালটা যে আমার কি ক'রে কাটলো সে আমিই জানি । কিন্তু ছপুরবেলা স্বামীর মুখ থেকেই যে কথা শুন্লুম, তাতে বিশ্বাসের আর অবশিষ্ট রহিল না ।

খেতে বসিয়ে শাশুড়ী বললেন, “কাল তোমাকে বলিনি বাছা, কিন্তু এ বউ নিয়ে ত আর ঘর করিতে পারিনে ঘনশ্রাম ! কালকের কাণ্ড ত শুনেছ ?”

স্বামী বললেন, “শুনেছি মা !”

শাশুড়ী বললেন, “তা হলে যা হোক, এর একটা ব্যবস্থা কর ।”

স্বামী একটুখানি হেসে বললেন, “ব্যবস্থা করার মালিক ত তুমি নিজেই মা ।”

শাশুড়ী বললেন, “তা কি আর পারিনে বাছা, একদিনেই পারি । এত বড় ধাড়ী মেয়ে, আমার ত বিয়ে দিতেই ইচ্ছে ছিল না । শুধু—”

স্বামী বললেন, “সে কথা ভেবে আর লাভ কি মা ! আর ভালমন্দ বাই হোক, বাড়ীর বড়-বোকে ত আর ফেলতে পারবে না ! ও চায় আমি একটু ভাল খাই-দাই । ভাল, সে ব্যবস্থাই কেন করে দাও না মা !”

শাশুড়ী বললেন, “অবাক করলি ঘনশ্রাম । আমি কি ভালমন্দ খেতে দিতে জানিনে যে, আজ ও এসে আমাকে শিখিয়ে দেবে ? আর তোমারই বা দোষ কি বাবা ! অত বড় বৌ যেদিন এসেছে, সেই দিনই জানতে পেরেছি, সংসার এবার ভাঙল । তা বাছা, আমার গিল্পিপনায় আর না যদি চলে, ওর হাতেই না হয় ভাঁড়ারের চাবি দিচ্ছি । কৈ গা, বড়-বউ-মা, বেরিয়ে এসো গো, চাবি নিয়ে যাও”—বলে শাশুড়ী কন্যাৎ করে চাবির গোছা রান্নাঘরের দাওয়ার ওপর ফেলে দিলেন ।

স্বামী আর একটি কথাও কইলেন না ; মুখ বুজে তাত খেয়ে বাইরে

যাবার সময় বলতে বলতে গেলেন, “সব মেরেমানুষের ঐ এক রোগ, কাকেই বা কি বলি !”

আমার বুকের মধ্যে যেন আত্মাদের জোয়ার ডেকে উঠল। আমি কেন ঝগড়া করেচি, তা উনি জানতে পেরেছেন, এই কথাটা শতবার মুখে আবৃত্তি করে সহস্র রকমে মনের মধ্যে অনুভব করিতে লাগলুম। সকালের সমস্ত কথা আমার যেন ধুয়ে মুছে গেল !

এখন কতবার মনে হয়, ছেলেবেলা থেকে কাজের অকাজের কত বই পড়ে কত কথাই শিখেছিলুম, কিন্তু এ কথাটা কোথাও যদি শিখতে পেতুম, পৃথিবীতে তুচ্ছ একটি কথা শুছিয়ে বলবার দোষে, ছোট একটি কথা মুখ ফুটে না বলবার অপরাধে, কত শত ঘর-সংসারই না ছারখার হয়ে যায়। হয় ত, তাহলে এ কাহিনী লেখবার আজ আবশ্যকই হ'ত না।

তাই ত বার বার বলি, ওরে হতভাগী ! এত শিখেছিলি, এটা শুধু শিখিস্নে, মেয়েমানুষের কার মানে মান ! কার হতাদরে তোদের মানের অট্টালিকা তাসের অট্টালিকার মতই এক নিমিষে একটা ফুঁয়ে ধুলিসাৎ হয়ে যায় !

তবে, তোর কপাল পুড়ে না ত পুড়ে কার ! সমস্ত সন্ধ্যাবেলাটা ঘরে খিল দিয়ে যদি সাজ-সজ্জাই করুলি, অসময়ে ঘুমের ভাণ করে যদি স্বামীর পালঙ্কের একধারে গিয়ে শুতেই পারুলি, তাঁকে একটা সাড়া দিতেই কি তোর এমন কণ্টরোধ হ'ল ? তিনি ঘরে ঢুকে ঘিঘায়, সঙ্কোচে বার বার ইতস্ততঃ করে যখন বেরিয়ে গেলেন, একটা হাত বাড়িয়ে তাঁর হাতটা ধরে ফেলতেই কি তোর হাতে পক্ষাঘাত হ'ত ? সেই ত সারা-রাত্রি ধরে বাটীতে পড়ে পড়ে কাঁদুলি, একবার মুখ ফুটে বলতেই কি শুধু এত বাধা হ'ল যে, আচ্ছা, তুমি তোমার বিছানাতে এসে শোও, আমি আমার ভূমি-শয্যাতে না হয় ফিরে যাচ্ছি।

অনেক বেলায় যখন ঘুম ভাঙল, মনে হ'ল যেন জ্বর হয়েছে। উঠে বাইরে যাচ্ছি, স্বামী এসে ঘরে ঢুকলেন। আমি মুখ নীচু করে একপাশে দাঁড়িয়ে রইলুম, তিনি বললেন, “তোমাদের গ্রামের নরেনবাবু এসেছেন।”

বুকের ভেতরটায় থক্ ক'রে উঠল !

স্বামী বলতে লাগলেন, “আমাদের নিখিলের তিনি কলেজের বন্ধু। চিতোর বিলে হাঁস শীকার করবার জন্য কলকাতায় থাকতে সে বুঝি কবে নেমস্তন্ন ক'রে এসেছিল, তাই এসেছেন। তুমিও তাঁকে বেশ চেনো, না ?”

উঃ—মানুষের স্পর্শের কি একটা সীমা থাকতে নেই !

বাড়ি নেড়ে জানালুম, আছে। কিন্তু, ঘুণায়-লজ্জায় নখ থেকে চুল পর্যন্ত আমার তেতো হ'য়ে গেল।

স্বামী বললেন, “তোমার প্রতিবেশীর আদর-যত্নের ভার তোমাকেই নিতে হবে।”

শুনে এমনি চমকে উঠলুম যে, ভয় হ'ল, হয় ত আমার চমকটা তাঁর চোখে প'ড়েচে। কিন্তু এদিকে তাঁর দৃষ্টি ছিল না। বললেন, “কা'ল রাত্রি থেকেই মায়ের বাতটা ভয়ানক বেড়েচে। এদিকে নিখিলও বাড়ী নেই, অখিলকেও তার আফিস করতে হবে।”

মুখ নীচু কোরে কোন মতে বললুম, “তুমি ?”

“আমার কিছুতেই থাকুঁয়ার যো নেই। রায়গঞ্জে পাট কিনতে না গেলেই নয়।”

“কখন ফিবে ?”

“ফিরতে আবার কা'ল এই সময়। রাত্রিটা সেখানেই থাকতে হবে।”

“তা' হলে আর কোথাও তাঁকে যেতে বল। আমি বউ-মানুষ, স্বস্তরবাড়ীতে তাঁর সামনে বা'র হ'তে পারুব না।”

স্বামী বললেন, “ছি তা কি হয় ! আমি সমস্ত ঠিক ক’রে দিয়ে যাচ্ছি, তুমি সামনে না বা’র হও, আড়াল থেকে গুছিয়ে গাছিয়ে দিয়ো ।” এই বলে তিনি বাইরে চ’লে গেলেন ।

সেই দিন পাঁচ মাস পরে আবার নরেনকে দেখলুম । ছপুরবেলা সে খেতে ব’সেছিল, আমি রান্নাঘরের দোরের আড়ালে ব’সে কিছুতেই চোখের কোঁতুল থামাতে পারলুম না । কিন্তু চাইবামাত্রই আমার সমস্ত মনটা এমন একপ্রকার বিতুষায় ভ’রে গেল যে, সে পরকে বোঝানো শক্ত । মস্ত একটা তেঁতুলবিছে এঁকেবঁকে চ’লে যেতে দেখলে সর্কাজ যেমন ক’রে ওঠে, অথচ যতক্ষণ সেটা দেখা যায়, চোখ ফিরতে পারা যায় না, ঠিক তেমনি কোরেই আমি নরেনের পানে চেয়ে রইলুম । ছি, ছি, ওর ওই দেহটাকে কি কোরে যে একদিন ছুঁয়েছি, মনে পড়তেই সর্কশরীর কাঁটা দিয়ে মাথার চুল পর্যন্ত আমার খাড়া হয়ে উঠল ।

খেতে খেতে সে মাঝে মাঝে চোখ তুলে চারিদিকে কি যে খুঁজছিল, সে আমি জানি । আমাদের রাঁধুনী কি একটা তরকারি দিতে গেলে, সে হঠাৎ যেন ভারি আশ্চর্য হ’য়ে জিজ্ঞাসা করলে, “হাঁ গা, তোমাদের বড়বোঁ যে বড় বেরুলো না ?” •

রাঁধুনী জানত যে, ইনি আমাদের বাপের বাড়ীর লোক—গ্রামের জমীদার । তাই বোধ করি খুসী করবার জন্মই হাসির ভঙ্গীতে একরুড়ি মখে কথা বলে তার মন যোগালে । বললে, “কি জানি বাবু, বড় বোঁ-মার ভারি লজ্জা—নইলে তিনিই ত আপনার জন্ম আজ নিজে রাঁধলেন । রান্নাঘরে ব’সে তিনিই ত আপনার সব খাবার এগিয়ে গুছিয়ে দিচ্ছেন । লজ্জা কোরে কিন্তু কম-মম খাবেন না বাবু, তা’হলে তিনি বড় রাগ করবেন, আমাকে ব’লে দিলেন ।”

মানুষের শয়তানীর অন্ত নেই, দুঃসাহসেরও অবধি নেই । সে স্বচ্ছন্দে স্নেহের হাসিতে মুখখানা রান্নাঘরের দিকে তুলে চোঁচিয়ে বললে, “আমার

কাছে তোর আবার লজ্জা করে সহু? আর আর, বেরিয়ে আর। অনেক দিন দেখিনি, একবার দেখি।”

কাঠ হ’য়ে সেই দরজা ধরে দাঁড়িয়ে রইলুম। আমার মেজ-জ্ঞাও রান্নাঘরে ছিল, ঠাট্টা ক’রে বললে, “দিদির সবভাতেই বাড়াবাড়ি। পাড়ার লোক, ভাইয়ের মত—বিয়ের দিন পর্য্যন্ত সামনে বেরিয়েচ, কথা কয়েচ, আর আজই যত লজ্জা! একবার দেখতে চাচ্চেন, যাও না।”

এর আর জবাব দেব কি?

বেলা তখন দুটো-আড়াইটে, বাড়ীর সবাই যে যার ঘরে শুয়েচে, চাকরটা এসে বাইরে থেকে বললে, “বাবু পাণ চাইলেন মা।”

“কে বাবু?”

“নরেনবাবু।”

“তিনি শীকার করতে যাননি?”

“কই না, বৈঠকখানায় শুয়ে আছেন যে।”

তা’হলে শীকারের ছলটাও মিথ্যে!

পাণ পাঠিয়ে দিয়ে জানালায় এসে বসলুম। এ বাড়ীতে আসা পর্য্যন্ত এই জানালাটিই ছিল সব চেয়ে আমার প্রিয়। নীচেই ফুল-বাগান, এক ঝাড় চামেলী ফুলের গাছ দিয়ে সম্মুখটা ঢাকা; এখানে বসলে বাইরের সমস্ত দেখা যায়, কিন্তু বাইরে থেকে কিছুই দেখা যায় না।

আমি মানুষের মনের এই বড় একটা অদ্ভুত কাণ্ড দেখি যে, যে বিপদটা হঠাৎ তার ঘাড়ের পিঠে এসে পড়ে তাকে একান্ত অস্থিরও উদ্ভিন্ন ক’রে দিয়ে যায়, অনেক সময়ে সে তাকেই একপাশে ঠেলে দিয়ে একটা ভুল কথার চিন্তা করতে বসে যায়। বাইরে পাণ পাঠিয়ে দিয়ে আমি নরেনের কথাই ভাবতে বসেছিলুম সত্যি, কিন্তু, কখন কোন্ কাকে যে আমার স্বামী এসে আমার সমস্ত মন জুড়ে বসে গিয়েছিলেন, সে আমি টেরও পাইনি।

আমার স্বামীকে আমি যত দেখছিলাম, ততই আশ্চর্য্য হয়ে যাচ্ছিলাম। সব চেয়ে আশ্চর্য্য হতুম—তঁার ক্ষমা করবার ক্ষমতা দেখে। আগে আগে মনে হ'ত, এ তাঁর দুর্বলতা, পুরুষের অভাব। শাসন করবার সাধ্য নেই বলেই ক্ষমা করেন। কিন্তু যত দিন যাচ্ছিল, ততই টের পাচ্ছিলাম, যেমন বুদ্ধিমান তেমনি দৃঢ়। আমাকে যে তিনি ভেতরে ভেতরে কত ভালবেসেছেন, সে ত আমি অসংশয়ে অনুভব করতে পারি, কিন্তু সে ভালবাসার ওপর এতটুকু জোর খাটাবার সাহস আমার ত হয় না।

একদিন কথায় কথায় বলেছিলাম, “আচ্ছা, তুমিই বগদৌর সর্বস্ব, কিন্তু তোমাকে যে বাড়ীশুদ্ধ সবাই অযত্ন-অবহেলা ক’রে, এমন কি অভ্যাচার করে, এ কি তুমি ইচ্ছা করলে শাসন ক’রে দিতে পার না?”

তিনি হেসে জবাব দিয়েছিলেন, “ঠেক, কেউ ত অযত্ন করে না।”

কিন্তু আমি নিশ্চয় জানতুম, কিছুই তাঁর অবিদিত ছিল না।

বললাম, “আচ্ছা, যত বড় দোষই হোক, তুমি কি সব মাপ করতে পারো?”

তিনি তেমনি হাসিমুখে বললেন, “যে সত্যি ক্ষমা চায়, তাকে করতেই হবে—এ যে আমাদের মহাপ্রভুর আদেশ গো।”

তাই এক-একদিন চুপ ক’রে বসে ভাবতুম, ভগবান যদি সত্যিই নেই, তাঁ’ হলে এত শক্তি, এত শাস্তি, ইনি পেলেন কোথায়? এই যে আমি জীবন কঠব্য একদিনের জন্তে করিনে, তবু ত তিনি কোন দিন স্বামীর জোর নিয়ে আমার অমর্যাদা অপমান করেন না?

আমাদের ঘরের কুলুঙ্গিতে একটি স্বেত-পাথরের গৌরাকৃষ্ণী ছিল, আমি কত রাত্রে ঘুম ভেঙ্গে দেখেছি, স্বামী বিছানার উপর স্তব্ধ হয়ে বসে একদৃষ্টে তাঁর পানে চেয়ে আছেন, আর হুঁচকু ব’য়ে অশ্রুর ধারা ব’য়ে যাচ্ছে। সময়ে সময়ে তাঁর মুখ দেখে আমারও যেন কান্না আসত, মনে হ’ত, অমনি ক’রে একটা দিনও কাঁদতে পারলে বুঝি মনের অর্ধেক বেদনা

কমে যাবে। পাশের কুলুঙ্গিতে তাঁর খানকয়েক বড় আদরের বই ছিল, তাঁর দেখাদেখি আমিও মাঝে মাঝে পড়তুম। লেখাগুলো যে আমি সত্যি ব'লে বিশ্বাস করতুম, তা নয়, তবুও এমন কত দিন হয়েছে, কখন পড়ায় মন লেগে গেছে, কখন বেলা ব'য়ে গেছে, কখন দু'কোঁটা চোখের জল গড়িয়ে গালের উপর শুকিয়ে অাছে, কিছুই ঠাওর পাইনি। কত দিন হিংসে পর্য্যন্ত হ'য়েছে, তাঁর মত আমিও যদি এগুলি সমস্ত সত্যি ব'লেই ভাবতে পারতুম!

কিছু দিন থেকে আমি বেশ টের পেতুম, কি একটা ব্যথা যেন প্রতিদিনই আমার বুকের মধ্যে জমা হয়ে উঠছিল। কিন্তু, কেন কিসের জন্মে, তা' কিছুতে হাতড়ে পেতুম না। শুধু মনে হ'ত, আমার যেন কেউ কোথাও নেই। ভাবতুম, মায়ের জন্মেই বুঝি ভেতরে ভেতরে মন কেমন করে, তাই কত দিন ঠিক করেচি, কালই পাঠিয়ে দিতে বোলব, কিন্তু যাই মনে হ'ত, এই ঘরটি ছেড়ে আর কোথাও যাবি, অমনি সমস্ত সঙ্কল্প কোথায় যে ভেসে যেত, তাকে মুখ ফুটে বলাও হ'ত না।

মনে করুন, যাই, কুলুঙ্গি থেকে বইখানা এনে একটু পড়ি। আজ-কাল এই বইখানি হয়েছিল আমার অনেক দুঃখের সাক্ষ্য। কিন্তু উঠতে গিয়ে হঠাৎ আঁচলে একটা টান পড়তেই ফিরে চেয়ে নিজের চক্ষুকে যেন বিশ্বাস হ'ল না। দেখি, আমার আঁচল ধ'রে জানালার বাইরে দাঁড়িয়ে নরেন। একটু হলোই টেঁচিয়ে ফেলেছিলুম আর কি! সে কখন এসেচে, কতক্ষণ এ ভাবে দাঁড়িয়ে আছে, কিছুই জানতে পারিনি। কিন্তু কি ক'রে যে সেদিন আপনাকে সামলে ফেলেছিলুম, আমি আজও ভেবে পাইনে। ফিরে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞাসা করলুম, “এখানে এসেচ কেন? শীকার করতে?”

নরেন বললে, “বোস, বল্চি।”

আমি জানালার ওপর বসে পড়ে বললুম, “শীকার করতে যাওনি কেন?”

নরেন বল্লে, “খনশ্রামদাবুর ছকুম পাইনি। • যাবার সময় ব’লে গেলেন, আমরা বৈষ্ণব, আমাদের বাড়ী থেকে জীবহত্যা করা নিষেধ।”

চক্ষের নিমেষে স্বামী-গর্বে আমার বুকখানা ফুলে উঠল। তিনি কোন কর্তব্যই ভোলেন না, সেদিকে তাঁর একবিন্দু দুর্বলতা নেই! মনে মনে ভাবলুম, এ লোকটা দেখে যাক, আমার স্বামী কত বড়!

বল্লুম, “তাহ’লে বাড়ী ফিরে গেলে না কেন?”

সে লোকটা গরাদের ফাঁক দিয়ে ধপ্ ক’রে আমার হাতটা চেপে ধরে বল্লে, “সহু, টাইফয়েড জ্বরে মরুতে মরুতে বেঁচে উঠে এখন শুন্লুম, তুমি পনের হয়েচ, আর আমার নেই, তখন বার বার ক’রে বল্লুম, ভগবান্, আমাকে বাঁচালে কেন? তোমার কাছে আমি এইটুকু বয়সের মধ্যে এমন কি পাপ করেচি—যার শাস্তি দেবার জন্ত আমাকে বাঁচিয়ে রাখলে।”

বল্লুম, “তুমি ভগবান্ মানো?”

নরেন খতমত খেয়ে বলতে লাগল, “না—হাঁ—না, মানিনে, কিন্তু সে সময়ে কি জানো—”

“থাক্ গে—তার পরে?”

নরেন ব’লে উঠল, “উঃ—সে আমার কি দিন, যেদিন শুন্লুম, তুমি আমারই আছো,—শুধু নামেই অণ্ডের, নইলে আমারই চিরকাল, শুধু আমারই! আজও একদিনের জন্তে আর কারও শয্যায় রাত্রি—”

“ছি ছি, চুপ করো! কিন্তু কে তোমাকে ৩ খবর দিলে? কার কাছে শুন্লে।”

“তোমাদের যে দাসী তিন চার দিন হ’ল বাড়ী যাবার নাম ক’রে চলে গেছে, যে—”

“যুক্ত কি তোমার লোক ছিল?” ব’লে জোর ক’রে তার হাত ছাড়াতে গেলুম, কিন্তু, এবারেও সে তেমনি সজোরে ধ’রে রাখলে। তার

চোখ দিয়ে কোঁটা-দুই জলও গড়িয়ে পড়ল। বললে, “সব্ব, এমনি কোরেই কি আমাদের জীবনের শেষ হবে? এমন অসুখে না পড়লে আজ কেউ ত আমাদের আলাদা ক’রে রাখতে পারত না! যে অপরাধ আমার নিজের নয়, তার জন্য কেন এত বড় শাস্তি ভোগ করব? লোকে ভগবান, ভগবান করে, কিন্তু তিনি সত্যি থাকলে কি বিনা-দোষে এতবড় সাজা আমাদের দিতেন? কথক না। তুমিই বা কিসের জন্যে একজন অজানা-অচেনা, মুখ্য লোকের—”

“থাক, থাক, ও কথা থাক।”

নরেন চমকে উঠে বললে, “আচ্ছা, থাক, কিন্তু যদি জানতুম, তুমি সুখে আছ, সুখী হয়েচ, তা হলে হয় ত একদিন মনকে সান্ত্বনা দিতে পারতুম, কিন্তু, কোন সম্বলই যে আমার হাতে নেই—আমি বাঁচব কি কোরে?”

আবার তার চোখে জল এসে পড়ল। এবার সে আমার হাতটাই টেনে নিয়ে তার নিজের চোখের জল মুছে বললে, “এমন কোন সভ্যদেশ পৃথিবীতে আছে—যেখানে এত বড় অত্যাচার হ’তে পারত! মেয়েমানুষ ব’লে কি তার প্রাণ নেই, তার ইচ্ছেই বিরুদ্ধে বিয়ে দিয়ে এমন ক’রে তাকে সারাজীবন দব্ব করবার অধিকার সংসারে কার আছে? কোন দেশের মেয়েরা ইচ্ছে করলে এমন বিয়ে লাখি মেরে ভেঙ্গে দিয়ে যেখানে খুলি চ’লে যেতে না পারে?”

এ সব কথা আমি স্তম্ভিতই জানতুম। আমার মামার ঘরে নব্য যুগের সাম্য-মৈত্রী-স্বাধীনতার কোন আলোচনাই বাকি ছিল না। আগার বকের ভেতরটা কেমন ঘেন ছলতে লাগল। বললুম, “তুমি আমাকে কি করতে বল?”

নরেন বললে, “আমি তোমাকে কোন কথাই বলব না। এইটুকু শুধু জানিয়ে যাবো যে, মরণের গ্রাস থেকে উঠে পর্যাণ্ড আমি এই

আজকের দিনের প্রতীক্ষা ক'রেই পথ চেয়েছিলুম। তার পরে হয় ত একদিন শুনতে পাবে, যেখান থেকে উঠে এসেছি, তার কাছেই ফিরে চ'লে গেছি। কিন্তু তোমায় কাছে এই আমার শেষ নিবেদন রইল, সত্ব, বেঁচে থাকতে যখন কিছুই পেলুম না, মরণের পরে যেন ঐ চোখের দু'কোঁটা জল পাই। আত্মা ব'লে যদি কিছু থাকে, তার তাতেই তৃপ্তি হবে।”

আমার হাতটা তার হাতের মধ্যেই রহিল—চুপ ক'রে ব'সে রইলুম। এখন ভাবি, সেদিন যদি ঘৃণাগ্রস্ত জানতুম, মানুষের মনের দাম এই একেবারে উন্টো ধারায় বইয়ে দিতে এইটুকু মাত্র সময়, এইটুকু মাত্র মাল-মসলার প্রয়োজন, তা হ'লে যেমন কোরে হোক, সেদিন তার হাত ছাড়িয়ে নিয়ে জানালা বন্ধ ক'রে দিতুম, কিছুতে তার একটা কথাও কাণে ঢুকতে দিতুম না। ক'টা কথা, ক'-কোঁটা চোখের জলই বা তার ধরচ হয়েছিল? কিন্তু নদীর প্রচণ্ড-স্রোতে পাতা শুদ্ধ শরগাছ যেমন কোরে কাঁপতে থাকে, তেমনি কোরে আমার সমগ্র দেহটা কাঁপতে লাগল, মনে হ'তে লাগল, নরেন যেন কোন অদ্ভুত কৌশলে আমার পাঁচ আঙ্গুলের ভেতর দিয়ে, পাঁচশ' বিদ্যুতের ধারা আমার সর্ব্বাঙ্গে বইয়ে দিয়ে, আমার পায়ের নখ থেকে চুলের ডগা পর্য্যন্ত অবশ ক'রে আনচে। সেদিন মাঝখানের সেই লোহার গরাদেগুলো যদি না থাকত, আর সে যদি আমাকে টেনে তুলে নিয়ে পালাতো, হয় ত আমি একবার টেঁচাতে পর্য্যন্ত পারতুম না—“ওগো, 'কে আছ, আমায় রক্ষা কর।' দু'জনে কতক্ষণ এমন স্তব্ধ হয়ে ছিলুম, জানিনে, সে হঠাৎ ব'লে উঠল, “সত্ব!”

“কেন?”

“তুমি ত বেশ জানো, আমাদের মধ্যে শাস্ত্রগুলো শুধু মেয়েমানুষকে বেঁধে রাখবার শেকল মাত্র! যেমন কোরে হোক, আটকে রেখে তাদের

সেবা নেবার ফন্দি । সতীর মহিমা কেবল মেয়েমানুষের বেলা—পুরুষের বেলায় সব কঁাকি ! আত্মা আত্মা যে করি, সে কি মেয়েমানুষের দেহে নেই ? তার কি স্বাধীন-সত্তা নেই ? সে কি শুধু এসেছিল পুরুষের সেবাদাসী হবার জন্তে ?”

“বউ-মা, বলি কথা কি তোমাদের শেষ হবে না বাছা ?”

মাথার ওপর বাজ ভেঙে পড়লেও বোধ করি, মানুষে এমন কোরে চমকে ওঠে না, আমরা দু’জনে যেমন কোরে চমকে উঠলুম । নরেন হাত ছেড়ে দিয়ে বৃষ্টি পড়ল আমি মুখ ফিরিয়ে দেখলুম, বারান্দায় খোলা জানালার ঠিক স্রুখে দাঁড়িয়ে আমার শাশুড়ী ।

বললেন, “বাছা, এ পাড়ার লোকগুলো ত তেমন সত্য-ভব্য নয়, এমন কোরে ঝোপের মধ্যে দাঁড়িয়ে কান্না-কাটি করতে দেখলে হয় ত বা দোষের ভেবে নেবে । বলি, বাবুটিকে ঘরে ডেকে পাঠালেই ত দেখতে শুনতে সব দিকে বেশ হ’ত !”

কি একটা জবাব দিতে গেলুম, কিন্তু মুখের মধ্যে জিভটা আমার আড়ষ্ট হয়ে রইল—একটা কথাও ফুটল না ।

তিনি একটুখানি হেসে বললেন, “বলতে ত পারিনে, বাছা, শুধু ভেবেই মরি, বউ-মাটি কেন আমার এত কষ্ট স’য়ে মাটিতে শুয়ে থাকেন । তা’ বেশ ! বাবুটি নাকি ছুপুরবেলা চা খান । চা তৈরীও হয়েছে—একবার মুখ বাড়িয়ে জিজ্ঞাসা কর দেখি, বউ-মা চায়ের পিয়ালাটা বৈঠকখানায়, পাঠিয়ে দেব, না, ঐ বাগানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই খাবেন ?”

উঠে দাঁড়িয়ে প্রবল চেষ্টায় তবে কথা কইতে পারলুম, বললুম, “ভূমি কি রোজ এমনি কোরে আমার ঘরে আড়ি পাতো মা ?”

শাশুড়ী মাথা নেড়ে বললেন, “না, মা, সময় পাই কোথা ? সংসারের কাজ ক’রেই ত সায়তে পারিনে । এই দেখ না বাছা, বাতে ময়ূচি, তবু চা তৈরী করতে রান্নাঘরে চুকতে হয়েছিল । তা এই ঘরেই না হয় পাঠিয়ে

দিচ্ছি—বাবুটির আবার ভারি লজ্জার শরীর, আমি থাকতে হয় ত থাকেন না। তা যাচ্ছি আমি—” ব’লে তিনি ফিক্ ক’রে একটু মুচ্কে হেসে চ’লে গেলেন। এমনি মেয়েমানুষের বিদ্বেষ! প্রতিশোধ নেবার বেলায় শান্তুড়ী-বধূর মাত্র সঙ্কল্পের কোন উঁচুনিচুর ব্যবধানই রাখলেন না।

সেইখানেই মেঝের ওপর চোখ বুজে শুয়ে পড়লুম—সর্ব্বাঙ্গ ব’য়ে বরু বরু ক’রে ঘাম ব’রে সমস্ত মাটিটা ভিজ়ে গেল।

শুধু একটা সামান্যনা’ছিল, আজ তিনি আসবেন না,—আজকার রাত্রিটা অন্ততঃ চুপ ক’রে থাকতে পাবো, তাঁর কাছে কৈফিয়ৎ দিতে হবে না।

কতবার ভাবলুম উঠে বসি, কাজ কর্ত্ত করি—যেন কিছুই হয় নি—কিন্তু, কিছুতেই পারলুম না, সমস্ত শরীর যেন ধরু ধরু কর্ত্তে লাগলো।

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়ে গেল, এ ঘরে কেউ আলো দিতে এলো না।

রাত্রি তখন প্রায় আটটা, সহসা তাঁর গলা বাইরে থেকে কাণে আসতেই সমস্ত রক্ত-চলাচল যেন একেবারে থেমে গেল! তিনি চাকরকে জিজ্ঞাসা করছিলেন, “বন্ধু, নরেনবাবু হঠাৎ চলে গেলেন কেন রে?” চাকরের জবাব শোনা গেল না। তখন নিজেই বললেন, “খুব সম্ভব শীকার কর্ত্তে বারণ করেছিলেন ব’লে! তা উপায় কি!” অন্তরে চুপুতেই, শান্তুড়ী-ঠাকরুণ ডেকে বললেন, “একবার আমার ঘরে এসো ত বাবা!”

তাঁর যে এক মুহূর্ত্ত দেবী সইবে না, সে আমি জানতুম। তিনি যখন আমার ঘরে এলেন, আমি কিসের একটা প্রচণ্ড নিষ্ঠুর-আঘাত প্রতীক্ষা করেই যেন সর্ব্বাঙ্গ কাঠের মত শক্ত ক’রে পড়ে রইলুম, কিন্তু তিনি একটা কথাও বললেন না। কাপড়-চোপড় ছেড়ে সন্ধ্যা-আহ্নিক কর্ত্তে বেরিয়ে গেলেন, যেন কিছুই হয়নি—শান্তুড়ি তাঁকে যেন এইমাত্র একটা

কথাও বলেন নি। তার পরে যথাসময়ে খাওয়া-দাওয়া শেষ করে তিনি ঘরে শুতে এলেন।

সারা-রাত্রির মধ্যে আমার সঙ্গে একটা কথাও হ'ল না। সকালবেলা সমস্ত দ্বিধাসঙ্কোচ প্রাণপণে ঝেড়ে ফেলে দিয়ে রান্নাঘরে চুকতে যাচ্ছি, মেজ-জ্ঞা বললেন, “হেঁসেলে ছোমার আর এসে কাজ নেই দিদি, আজ আমিই আছি!”

বললুম, “তুমি থাকলে কি আমাকে থাকতে নেই মেজদি?”

“কাজ কি, ম-কি জন্তে বারণ করে গেলেন”, বলে তিনি যে ষাড় ফিরিয়ে টিপে টিপে হাসতে লাগলেন, সে আমি স্পষ্ট টের পেলাম। মুখ দিয়ে আমার একটা কথাও বা'র হ'ল না—আড়ষ্ট হয়ে কিছুক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে থেকে ঘরে ফিরে এলাম।

দেখলাম, বাড়ীশুদ্ধ সকলের মুখ ঘোর অন্ধকার, শুধু বাঁর মুখ সব চেয়ে অন্ধকার হবার কথা, তাঁর মুখেই কোন বিকার নেই। স্বামীর নিত্য-প্রসন্ন মুখ, আজও তেমনি প্রসন্ন!

হায় রে, শুধু একবার গিয়ে যদি বলি, প্রভু, এই পাপিষ্ঠার মুখ থেকে তার অপরাধের বিবরণ শুনে তাকে নিজের হাতে দণ্ড দাও, কিন্তু, সমস্ত লোকের এই বিচারহীম শাস্তি আর সহ হয় না! কিন্তু, সে ত কোন মতেই পারলাম না। তবুও এই বাড়ীতে এই ঘরের মধ্যেই আমার দিন কাটতে লাগল।

এ কেমন কোরে আমার দ্বারা সম্ভব হ'তে পেরেছিল, তা আজ আমি জানি! যে কাল মায়ের বুক থেকে পুত্রশোকের তার পর্য্যন্ত হালকা করে দেয়, সে যে এই পাপিষ্ঠার মাথা থেকে তার অপরাধের বোঝা লঘু করে দেবে, সে আর বিচিত্র কি? যে দণ্ড একদিন মানুষ অকাতরে মাথায় তুলে নেন, আর একদিন তাকেই সে মাথা থেকে ফেলতে পারলে বাঁচে! কালের ব্যবধানে অপরাধের ধোঁচা যত অস্পষ্ট, যত লঘু হয়ে

আসতে থাকে, দণ্ডের ভার ততই গুরুতর, ততই অসহ্য হ'য়ে উঠতে থাকে ! এই ত মানুষের মন ! এই ত তার গঠন ! তাকেই নিশ্চিত সংশয়ে মরিয়্য কোরে তোলে । একদিন, দু'দিন ক'রে যখন সাতদিন কেটে গেল, তখন কেবলই মনে হ'তে লাগল, এতই কি দোষ ক'রেছি যে, স্বামী একটা মুখের কথাও জিজ্ঞাসা না কোরে নির্কিঁচারে দণ্ড দিয়ে যাবেন ! কিন্তু তিনি যে সকলের সঙ্গে মিলে নিঃশব্দে আমাদের পীড়ন করে যাচ্ছেন, এ শ্রুতি যে কোথায় পেয়েছিলুম, এখন তাই শুধু ভাবি ।

সেদিন সকালে শুন্‌লুম, শান্তডী বল্‌চেন, “কিরে এলি মা মুক্ত ! পাঁচদিন ব'লে কত দিন দেরি কর্‌লি বল্‌ত বাছা ?”

সে যে কেন কিরে এসেচে, তা মনে মনে বুঝ্‌লুম ।

নাইতে যাচ্ছি, দেখা হ'ল । মুচ্কে হেসে হাতের মধ্যে একটা কাগজ গুঁজে দিলে । হঠাৎ মনে হ'ল, সে যেন এক টুকরো জলন্ত কয়লা আমার হাতের তেলোয় টিপে ধরেচে । ইচ্ছে হ'ল, তখুনি কুটি-কুটি ক'রে ছিঁড়ে ফেলে দিই । কিন্তু সে যে নরেনের চিঠি ! না প'ড়েই যদি ছিঁড়ে ফেলতে পার্ব, তা হ'লে মেয়েমানুষের মনের মধ্যে বিশ্বের সেই অফুরন্ত চিরন্তন কোতুহল জমা হজ্জ' রয়েছে কিসের জন্তে ? নির্জল পুকুরঘাটে জলে পা ছড়িয়ে দিয়ে চিঠি খুলে বস্‌লুম । অনেকক্ষণ পর্যন্ত একটা কথাও পড়তে পার্‌লুম না । চিঠি লাল কালীতে লেখা । মনে হ'তে লাগল, তার রাঙা অক্ষরগুলো যেন একপাল কেন্নোর বাচ্চার মত গায়ে গায়ে জড়িয়ে কিল-বিল ক'রে ন'ড়ে ন'ড়ে বেড়াচ্ছে ! তার পঠে পড়্‌লুম—একবার—দু'বার—তিনবার পড়্‌লুম । তার পরে টুকরো টুকরো ক'রে ছিঁড়ে জলে ভাসিয়ে দিয়ে স্বান ক'রে বরে কিরে এলুম । কি ছিল তাতে ? সংসারে যা সব চেয়ে বড় অপরাধ, তাই লেখা ছিল ।

ধোপা এসে বললে, “মা ঠাকুরণ, বাবুর ময়লা কাপড় দাও।”

জামার পকেটগুলো সব দেখে দিতে গিয়ে একখানা পোষ্টকার্ড বেরিয়ে এল, হাতে ভুলে দেখি, আমার চিঠি, মা লিখেছেন। তারিখ দেখলুম, পাঁচ দিন আগের, কিন্তু আজও আমি পাইনি।

প’ড়ে দেখি সর্বনাশ! মা লিখেছেন, শুধু রান্না-ঘরটি ছাড়া আর সমস্ত পুড়ে ভস্মসাৎ হয়ে গেছে। এই ঘরটির মধ্যে কোনমতে সবাই মাথা গুঁজে আছেন।

দু’চোখ জ্বালা করতে লাগল, কিন্তু এককোঁটা জল বেরুল না। কতক্ষণ যে এ ভাবে বসেছিলাম, জানিনে, ধোপার চীৎকারে আবার সজাগ হয়ে উঠলুম। তাড়াতাড়ি তাকে কাপড়গুলো ফেলে দিয়ে, বিছানায় এসে শুয়ে পড়লুম। এইবার চোখের জলে বাগিস ভিজে গেল। কিন্তু, এই কি তাঁর দৈবপরায়ণতা! আমার মা গরীব, একবিন্দু সাহায্য করতে অনুরোধ করি, এই ভয়ে চিঠিখানা পর্যন্ত আমাকে দেওয়া হয়নি। এত বড় ক্ষুদ্রতা আমার নাস্তিক মামার দ্বারা কি কখনো সম্ভব হ’তে পারত!

আজ তিনি ধরে আসতে কথা ক’ইলুম। বললুম, “আমাদের বাড়ী পুড়ে গেছে।”

তিনি মুখপানে চেয়ে বললেন, “কোথায় শুন্লে?”

গায়ের ওপর পোষ্টকার্ডখানা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে জবাব দিলুম, “ধোপাকে কাপড় দিতে তোমারই পকেট থেকে পেলুম। দেখ, আমাকে নাস্তিক ব’লে তুমি ঘৃণা কর জানি, কিন্তু, যারা লুকিয়ে পরের চিঠি পড়ে, আড়ালে গোয়েন্দাগিরি ক’রে বেড়ায়, তাদের আমরাও ঘৃণা করি। তোমার বাড়ীশুদ্ধ লোকেরই কি এই ব্যবসা?”

যে লোক নিজের অপরাধে মগ্ন হয়ে আছে, তার মুখের এই কথা! কিন্তু, আমি নিঃসংশয়ে বলতে পারি, এত বড় স্পর্ধিত আঘাত আমার

স্বামী ছাড়া আর কেউ, সহ করতে পারত না। মহাপ্রভুর শাসন কি অক্ষয়-কবচের মতই যে তাঁর মনটিকে অহর্নিশ ঘিরে রক্ষে করত, আমার এমন ভীক্ষ শূলও ধান্ ধান্ হয়ে পড়ে গেল।

একটুখানি স্নান হেসে বললেন, “কেমন অত্মমনস্ক হয়ে প’ড়ে কেল-ছিলুম, সত্ব, আমাকে মাপ কর।”

এই প্রথম তিনি আমাকে নাম ধরে ডাকলেন।

বল্লুম, “মিথ্যে কথা। তা হ’লে আমার চিঠি আমাকে দিতে। কেন এ খবর লুকিয়েছ, তাও জানি।”

তিনি বললেন, “শুধু দুঃখ পেতে বইত না। তাই ভেবেছিলুম, কিছু দিন পরে তোমাকে জানাবো।”

বল্লুম, “কেমন করে তুমি হাত গোণো, সে আমার জানতে বাকি নেই। তুমিই কি বাড়ীশুদ্ধ সবাইকে আমার পিছনে গোয়েন্দা লাগিয়েছ ? স্পাই ! ইংরেজ-মহিলারা এমন স্বামীর মুখ পর্যন্ত দেখে না, তা জানি ?”

ওরে হতভাগী ! বল, বল, যা মুখে আসে ব’লে নে। শাস্তি তোয় গেছে কোথায়, সবই যে তোলা রইল !

স্বামী স্তব্ধ হয়ে বসে রইলেন—একটা কথারও জবাব দিলেন না। এখন ভাবি, এত ক্রমা কর্তেও মানুষে পারে !

• কিন্তু আমার ভেতরে যত স্নান, যত অপমান, এতদিন ধীরে ধীরে জমা হয়ে উঠেছিল, একবার মুক্তি পেয়ে তারা কোন মতেই আর ফিরতে চাইলে না।

একটু থেমে আবার বল্লুম, “আমি হেঁসেলে চুকতে—”

তিনি একটুখানি যেন চমকে উঠে মাঝখানেই বলে উঠলেন, “উঃ, তাই বটে ! তাই আমার খাবার ব্যবস্থাটা আবার—”

বল্লুম, “সে নালিশ আমার নয়। বাঙ্গালীর ঘরে জন্মেছি বলেই যে তোমরা খুঁচে খুঁচে আমাকে তিল তিল করে মারবে, সে অধিকার

তোমাদের আমি কিছুতে স্বে না, তা নিশ্চয় জেনো। আমার মামার বাড়ীতে এখনো ত রান্না-ঘরটা বাকী আছে, আমি তার মধ্যেই আবার ফিরে যাব। কা'ল আমি যাচ্ছি।”

স্বামী অনেকক্ষণ চুপ ক'রে ব'সে থেকে বললেন, “যাওয়াই উচিত বটে! কিন্তু, তোমার গয়নাগুলো' রেখে যেয়ো।”

শুনে অবাক হ'য়ে গেলুম। এত হীন, এত ছোট স্বামীর স্ত্রী আমি। পোড়া মুখে হঠাৎ হাসি এলো। বললুম, “সেগুলো' কেড়ে নিতে চাও ত, বেশ, আমি রেখেই যাব।”

প্রদীপের ক্ষীণ আলোতে স্পষ্ট দেখতে পেলুম, তাঁর মুখখানি যেন শাদা হয়ে গেল! বললেন, “না না, তোমার কিছু গয়না আমি ভিক্ষে চাচ্ছি, আমার টাকার বড় অনাটন, তাই বাঁধা দেবো।”

কিন্তু এমনি পোড়াকপালী আমি যে, ও-মুখ দেখেও কথাটা বিশ্বাস করতে পারলুম না। বললুম, “বাঁধা দাও, বেচে ফ্যালো, যা ইচ্ছে কোরো, তোমাদের গয়নার ওপর আমার এতটুকু লোভ নেই।” ব'লে, তখনি বাক্স খুলে আমার সমস্ত গয়না বিছানার ওপর ছুঁড়ে ফেলে দিলুম। যে ছ'গাছি বালা মা দিয়েছিলেন, সেই ছ'টি ছাড়া গা থেকে পর্যন্ত সমস্ত গয়না খুলে ফেলে দিলুম। তাতেও তৃপ্তি হ'লো না, বেনারসী কাপড় জামা প্রভৃতি যা কিছু এঁরা দিয়েছিলেন, সমস্ত বার ক'রে টান্ মেরে ফেলে দিলুম।

স্বামী পাথরের মত স্থির-নিরীক হ'য়ে ব'সে রইলেন। আমার ঘৃণায় বিতৃষ্ণায় সমস্ত মনটা এমনি বিষিয়ে উঠল যে, এক ঘরের মধ্যে থাকার অসহ্য হ'য়ে পড়ল। বেরিয়ে এসে অন্ধকার বারান্দায় একধারে আঁচল পেতে শুয়ে পড়লুম। মনে হ'ল, দোরের আড়াল থেকে কে যেন বেরিয়ে গেল।

কান্নায় বুক কেটে যেতে লাগল, তবু প্রাণপণে, মুখে কাপড় গুঁজে দিয়ে মান বাঁচালুম।

কখন ঘুমিয়ে পড়েছিলুম জানিনে, উঠে দেখি, ভোর হয় হয়। ঘরে গিয়ে দেখি, বিছানা খালি, দু'একখানি ছাড়া প্রায় সমস্ত গয়নাই নিয়ে তিনি কখন বেরিয়ে গেছেন।

সারাদিন তিনি বাড়ী এলেন না। রাত্রি বারোটা বেজে গেল, তাঁর দেখা নাই।

তজ্জার মধ্যেও বোধ করি সজাগ ছিলাম। রাত্রি দু'টোর পর বাগানের দিকের সেই জানালাটার গায়ে খট-খট শব্দ শুনেই বুঝলুম, এ নরেন। কেমন করে যেন আমি নিশ্চয় জানতুম, আজ রাত্রে সে আসবে। স্বামী ঘরে নেই, এ খবর মুক্ত দেবেই এবং এ সুযোগে কিছুতে ছাড়বে না। কোথাও কাছাকাছি সে যে আছেই, এ যেন আমি ভাবী অমঙ্গলের মত অনুভব করতুম। নরেন এত নিঃসংশয় ছিল যে, সে অনায়াসে বললে—“দেয়ি কোরো না, যেমন আছে বেরিয়ে এসো, মুক্ত খিড়কি খুলে দাঁড়িয়ে আছে।”

বাগান পার হয়ে রাস্তা দিয়ে অনেকখানি অন্ধকারে এগিয়ে গিয়ে গাড়ীতে গিয়ে বসলুম। মা বসুমতি! গাড়ী শুদ্ধ হতভাগীকে সেদিন গ্রাস করলে না কেন?

কলকাতায় বউ-বাজারের ঐকুটা ছোট্ট বাসায় গিয়ে যখন উঠলুম, তখন বেলা সাড়ে-আটটা। আমাকে পৌঁছে দিয়েই নরেন তার নিজের বাসায় কিছুক্ষণের জন্তে চলে গেল। দাসী উপরের ঘরে বিছানা পেতে বেঁচেছিল, টলুতে টলুতে গিয়ে শুয়ে পড়লুম। আশ্চর্য্য, যে, যে কথা কখনও ভাবিনি, সমস্ত ভাবনা ছেয়ে, সেই কথাই আমার মনে পড়তে লাগল। আমি ন'বছর বয়সে একবার জলে ডুবে যাই, অনেক যন্ত্র-চেষ্টার পরে জ্ঞান হ'লে মায়ের হাত ধরে ঘরের বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়ি! মা শিয়রে বসে এক হাতে মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে, এক হাতে পাখার বাতাস করেছিলেন,—মায়ের মুখ, আর তাঁর সেই পাখা নিয়ে হাত নাড়াটা ছাড়া সংসারে আর যেন আমার কিছু রইল না।

দাসী এসে বললে, “বউ-মা, কলের জল চ’লে যাবে, উঠে চান ক’রে নাও।”

স্নান ক’রে এলুম, উড়ে-বায়ুণ ভাত দিয়ে গেল। মনে হয় কিছু খেয়েও ছিলাম, কিন্তু উঠতে উঠতে সমস্ত বমি হ’য়ে গেল। তার পরে হাত-মুখ ধুয়ে নিজের মত বিছানায় এসে শুয়ে পড়লাম। এই বোধ করি ঘুমিয়ে পড়েছিলাম।

স্বপ্ন দেখলুম, স্বামীর সঙ্গে ঝগড়া করছি। তিনি তেমনি নীরবে ব’সে আছেন, আর আমি গায়ের গয়না খুলে তাঁর গায়ে ছুঁড়ে ফেলছি; কিন্তু গয়নাগুলোও আর ফুরোয় না, আমার ছুঁড়ে ফেলাও খামে না। যত ফেলি, ততই যেন কোথা থেকে গয়নায় সর্বাঙ্গ ভ’রে ওঠে!

হঠাৎ হাতের ভারি অনন্তটা ছুঁড়ে ফেলতেই সেটা সজোরে গিয়ে তাঁর কপালে লাগল, সঙ্গে সঙ্গে তিনি চোখ বুজে শুয়ে পড়লেন, আর সেই ফাটা কপাল থেকে রক্তের ধারা ফিন্‌কি দিয়ে কড়িকাঠে গিয়ে ঠেকতে লাগল।

এমন করে কতক্ষণ যে কেটেছিল, আর কতক্ষণ যে কাটতে পারত বলতে পারিনে। যখন ঘুম ভাঙল, তখন চোখের জলে বালিস বিছানা ভিজ্জে গেছে।

চোখ চেয়ে দেখি, তখন অনেক বেলা আছে, আর নরেন পাশে ব’সে আমাকে ঠেলা দিয়ে ঘুম ভাঙাচ্ছে।

সে বললে, “স্বপ্ন দেখছিলেন! ইস, এ হয়েছে কি।” ব’লে কৌচাচ খুঁট দিয়ে মুখ মুছিয়ে দিলে।

স্বপ্নন? এক মুহূর্তে মনটা যেন স্তম্ভিত হ’য়ে গেল।

চোখ রগড়ে উঠে ব’সে দেখলুম, সুমুখেই মস্ত একটা কাগজে-মোড়া পার্শেল।

“ও কি?”

“তোমার জামা-কাপড় সব কিনে আনলুম!”

“তুমি কিনতে গেলে কেন?”

নরেন একটু হেসে বললে, “আমি ছাড়া আর কে কিনবে?”

* * * *

এত কাল আমি আর কখনও কাঁদিনি।” নরেন বললে, “আচ্ছা, পা ছেড়ে উঠে বোস্ বোন, আমি দিব্যি করুচি, আমি এক মায়ের পেটের ভাই-বোন। তোকে আমি যত ভালই বাসিনে কেন, তবু আমি আমার কাছ থেকে তোকে চিরকাল রক্ষে করব।”

“চিরকাল! না না, তাঁর পায়ের ওপর আমাকে তোমরা ফেলে দিয়ে চলে এসো, নরেন দাদা, আমার অদৃষ্টে যা হবার তা’ হোক। কাল সমস্ত রাত্রি তাঁকে চোখে দেখিনি, আজ আবার সমস্ত রাত্রি দেখতে না পেলে যে আমি ম’রে যাব ভাই!”

দাসী ঘরে প্রদীপ দিয়ে গেল। নরেন উঠে গিয়ে একটা মোড়ার ওপর ব’সে বললে, “মুক্তর কাছে আমি সমস্ত শুনেচি! কিন্তু তাঁকে যদি এতই ভালবাসতে, কোন দিন এক সঙ্গে ত’—”

তাড়াতাড়ি বললুম, “তুমি আমার বড় ভাই, এ-সব কথা আমাকে তুমি জিজ্ঞেসা কোরো না।”

নরেন অনেকক্ষণ চুপ ক’রে ব’সে থেকে বললে, “আমি আজই তোমাকে তোমাদের বাগানের কাছে রেখে আসতে পারি, কিন্তু, তিনি কি তোমাকে নেবেন? তখন গ্রামের মধ্যে তোমার দুর্গতি কি হবে, বল ত?” বুকের ভেতরটা কে যেন ছ’হাতে পাকিয়ে মুচড়ে দিলে। কিন্তু তখুনি নিজেকে সামলে নিয়ে বললুম, “যে নেবেন না, সে জানি, কিন্তু, তিনি যে আমাকে মাপ ক’রবেন, তাতে কোন সন্দেহ নেই। যত বড় অপরাধ হোক সত্যি সত্যি মাপ চাইলে তাঁর না বলবার যো

নেই, এ যে আমি তাঁর মূৰ্খই শুনেচি, ভাই ! আমাকে তুমি তাঁর পায়ের তলায় রেখে এসো নরেন দা', ভগবান্ তোমাকে রাজ্যোখর করবেন, আমি কায়মনে বল্চি ।”

মনে করেছিলুম, আর চোখের জল ফেলবো না, কিন্তু, কিছুতেই ধ'রে রাখতে পারলুম না, আবার ঝর্ঝর্ করে পড়তে লাগল । নরেন মিনিট খানেক চুপ করে বল্লে, “সহু, তুমি কি সত্যিই ভগবান্ মানো ?”

আজ চরম-স্থখে মুখ দিয়ে পরম-সত্য বার হয়ে গেল ; বললুম, “মানি । তিনি আছেন বলেই ত এত ক'রেও ফিরে যেতে চাইচি । নইলে, এইখানে গলায় দড়ী দিয়ে মরতুম, নরেন দাদা, ফিরে যাবার কথা মুখে আনতুম না ।”

নরেন বল্লে, “কিন্তু আমি ত মানিনে ।”

তাড়াতাড়ি বলে উঠলুম, “আমি বল্চি, আমার মত তুমিও একদিন নিশ্চয় মানবে ।”

“সে তখন বোঝা যাবে” বলে নরেন গম্ভীরমুখে ব'লে রইল । মনে মনে কি যেন ভাবচে বুঝতে পেরে আমি ব্যাকুল হয়ে উঠলুম । আমার এক মিনিট দেরি সহিছিল না, “বললুম, “আমাকে কখন রেখে আসবে, নরেন দা ?”

নরেন মুখ তুলে ধীরে ধীরে বল্লে, “সে কখনো তোমাকে নেবে না ।”

“সে চিন্তা কেন কর্চ ভাই ? নিন্ না নিন্ সে তাঁর ইচ্ছে । কিন্তু, আমাকে তিনি ক্ষমা করবেন, এ কথা নিশ্চয় বলতে পারি ।”

“ক্ষমা ! না নিলে ক্ষমা করা, না-করা, দুই-ই সমান । তখন তুমি কোথায় যাবে বল ত ? সমস্ত পাড়ার মধ্যে কত বড় একটা বিল্ডিং হৈ-টে গুণগোল পড়ে যাবে, একবার ভেবে দেখ দিকি !”

জরে কাঁদ-কাঁদ হয়ে বললুম, “সে ভাবনা তুমি এতটুকু কোরো না, নরেন দাদা ! তখন তিনিই আমার উপায় কোরে দেবেন ।”

নরেন আবার কিছুক্ষণ চুপ কোরে থেকে বুল্লে, “আর তোমারই না হয় একটা উপায় করবেন, কিন্তু আমার ত করবেন না ! তখন ?”

এ কথার কি জবাব দেব, ভেবে পেলুম না। বললুম, “তাতেই বা তোমার ভয় কি ?”

নরেন স্নানমুখে জোর ক’রে একটু হেসে বুল্লে, “ভয় ? এমন কিছু নয়, পাঁচ সাত বছরের জুতো জেল খাটতে হবে। শেষকালে এমন কোরে তুমি আমাকে ডোবাবে জানলে, আমি এতে হাতই দিই না। মনের এতটুকু স্থির নেই, এ কি ছেলেখেলা ?”

আমি কেঁদে ফেলে বললুম, “তবে আমার কি উপায় হবে তাই ? আমার সমস্ত অপরাধ তাঁর পায়ে নিবেদন না ক’রে ত আমি কিছুতে বাঁচব না !”

নরেন দাঁড়িয়ে উঠে বুল্লে, “শুধু নিজের কথাই ভাব্চ, আমার বিপদ ত ভাব্চ না ? এখন সব দিক্ না বুঝে আমি কোন কাজ করতে পারব না।”

“ও কি, তুমি বাসায় যাচ্চ না কি ?”

“হুঁ।”

রাগে, দুঃখে, হতাশাসে আমি মাটিতে লুটিয়ে পড়ে মাথা কুটে কাঁদতে লাগলুম, “তুমি সঙ্গে না যাও, এইখান থেকে আমার যাবার উপায় করে দাও, আমি একলা ফিরে যাবো। ওগো, আমি তাঁর দিব্যি কোরে বল্চি আমি কারুর নাম করব না—কাউকে বিপদে জঁড়াবো না, সমস্ত শাস্তি একা মাথা পেতে নেব।—তোমার দু’টি পায়ে পড়ি নরেন দা’ আমাকে আটকে রেখে আমার আর সর্বনাশ কোরো না।”

মুখ ভুলে দেখি, ঘরে সে নেই—পা টিপে টিপে বেরিয়ে গেছে। ছুটে গিয়ে সম্বর দরজায় দেখি, তালা বন্ধ। উড়ে-বামুণ বুল্লে, “বাবু চাবি নিয়ে চলে গেছেন, কাল সকালে এসে খুলে দেবেন।”

ঘরে ফিরে এসে আর একবার মাটির উপর লুটিয়ে পড়ে কাঁদতে কাঁদতে বল্লুম, “ভগবান! কখনো তোমাকে ডাকিনি আজ ডাক্টি, তোমার এই একান্ত নিরুপায় মহাপাপিষ্ঠা সন্তানের গতি করে দাও।”

আমার সে ডাক যে কত প্রচণ্ড, তার শক্তি যে কি দুর্নিবার, আজ সে শুধু আমিই জানি।

তবু সাত দিন কেটে গেল। কিন্তু, কেমন, ক’রে যে কাটল, সে ইতিহাস বলবার আমার সামর্থ্যও নেই, বৈধৰ্য্যও নেই। সে যাক।

বিকেলবেলায় আমার ওপরের ঘরের জানালায় বসে নীচে গলির পানে তাকিয়েছিলুম। আফিসের ছুটি হয়ে গেছে—সারাদিনের খাটুনির পর বাবুরা বাড়ীমুখো—হন্ হন্ ক’রে চ’লেচে। অধিকাংশই সামান্য গৃহস্থ। তাদের বাড়ীর ছবি আমার চোখের ওপর স্পষ্ট ফুটে উঠল। বাড়ীর মেয়েদের মধ্যে এখন সব চেয়ে কারা বেশি ব্যস্ত, জলখাবার সাজাতে, চা তৈরি ক’রতে সব চেয়ে কারা বেশি ছুটোছুটি করে বেড়াচ্ছে, সেটা মনে হতেই বুকের ভেতরটা ধক্ কোরে উঠল। মনে প’ড়ল, তিনিও সমস্ত দিনের হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রমের পর বাড়ী ফিরে এলেন। কোথায় কাপড়, কোথায় গামছা, কোথায় জল! ডাকাডাকির পর কেউ হয় ত সাড়াও দিলে না। তার পরে হয় ত, মেজ-দেওরের খাবারের সঙ্গে তাঁরও একটুখানি জলখাবারের যোগাড় মেজ-বৌ করে রেখেচে, না হয় ভুলেই গেছে! আমি ত আর নেই,—ভুলতে ভয়ই বা কি! “হয় ত বা শুধু এক গেলান জল চেয়ে খেয়ে ময়লা বিছানাটা কৌচা দিয়ে একটু ঝেড়ে নিয়ে শুয়ে পড়বেন। তার পরে রাত দুপুরে দুটো শুকনো—স্বরুঝরে ভাত, একটু ভাতে-পোড়া। ও-বেলায় একটুখানি ডাল হয়, ত বা আছে, হয় ত বা উঠে গেছে! সকলের দিয়ে-থুয়ে দুধ একটু বাঁচে ত সে পরম ভাগ্য! নিরীহ ভাল মানুষ, কাউকে কড়া-কথা বলতে পারেন না, কারো ওপর রাগ দেখাতে জানেন না—

ওরে মহাপাতকি ! .এত বড় নির্ভর-মহাশাপ তোর চেয়ে বেশি সংসারে কেউ কি কোন দিন ক'রেছে ? ইচ্ছে হ'ল এই লোহার গরাদেতে মাথাটা ছেঁচে ফেলে সমস্ত ভাবনা-চিন্তার এইখানেই শেষ ক'রে দিই !

বোধ করি অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত কোন দিকেই চোখ ছিল না, হঠাৎ কড়ানাড়ার শব্দে চমকে উঠে দেখি, সদর দরজায় দাঁড়িয়ে নরেন আর মুক্ত। তাড়াতাড়ি চোখ মুছে ফেলে নীচের বিছানায় উঠে এসে বসলুম। সেই দিন থেকে নরেন আর আসেনি। আমার সমস্ত মন যে কোথায় প'ড়ে আছে, সে নিঃসংশয়ে বুঝতে পেরেছিল ব'লে ভয়ে এ দিক্ মাড়াত না। তার নিশ্চয় ধারণা জন্মেছিল, বিপদে প'ড়লে স্বামীর বিরুদ্ধে আমি তার কোন উপকারেই লাগব না। তাই তার ভয়ও যেমন হয়েছিল, রাগও তেমনি হয়েছিল। ঘরে চুকে আমার দিকে চেয়েই হু'জনে একসঙ্গে চমকে উঠল, নরেন বললে,—

“তোমার এত অসুখ করেছিল ত আমাকে খবর দাওনি কেন ? তোমার বামুণটা ত আমার বাসা চেনে ?”

ঝি দালানে ঝাঁট দিচ্ছিল, সে খপ্ কোরে ব'লে বসল, “অসুখ করবে কেন ? শুধু জল খেয়ে থাকলে মীচুস রোগা হবে না বাবু ? ছুটি বেলা দেখছি ভাতের খালা যেমন বাড়া হয়, তেমনি পড়ে থাকে। অর্ধেক দিন ত হাতও দেন না।” শুনে হু'জনেই স্তব্ধ হ'য়ে আমার পানে “চেয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

সন্ধ্যার পর নরেন বাসায় চ'লে গেলে, মুক্তকে বুকে টেনে নিয়ে বললুম, “কেমন আছেন তিনি ?”

মুক্ত কেঁদে ফেললে। বললে,—“অদৃষ্ট ছাড়া পথ নেই বউ-মা, নইলে এমন সোণার সোয়ামীর ঘর করতে পেলে না ?”

“তুই ত ঘর করতে দিলিনে মুক্ত !”

মুক্ত চোক মুছে বললে,—“মনে হ'লে বৃকের ভেতরটায় খোঁক করতে

থাকে, সে আর তোমাকে কি বোলব ? বারু ছাড়া আজও সবাই জানে, তুমি বাড়ী পোড়ার খবর পেয়ে রাস্তিরেই রাগারাগি ক'রে বাপের বাড়ী চ'লে গেছ। তোমার শাওড়ী ত তাঁর হুকুম নেওয়া হয় নি ব'লে রাগ কোরে তাঁর সঙ্গে কথাবার্ত্তাই বন্ধ করে দিয়েচে। মাগী কি বজ্জাত না, কি বজ্জাত ! , যে কষ্টটা বারুকে দিচ্ছে, দেখলে পাষাণের দ্বংধ হয় ! সাথে কি আর তুমি ঝগড়া করুতে বউ-মা !”

“ঝগড়া করা আমার চিরকালের জন্তে ঘুচে গেল !” বলতে গিয়ে সত্যি সত্যি যেন দম্ আটকে এলো ।

আজ মুক্তর কাছে শুনতে পেলুম, আমাদের পোড়া বাড়ী আবার মেরামত হচ্ছে, তিনি টাকা দিয়েছেন। হয় ত সেই জন্তাই আমার গহনাগুলো হঠাৎ বাঁধা দেবার তাঁর প্রয়োজন হয়েছিল !

বলুম, “বল্ মুক্ত, সব বল্। যত রকমের বুক ফাটা খবর আছে, সমস্ত আমাকে একটি একটি কোরে শোনা—এতটুকু দয়া তোরা আমাকে করিসনে।”

মুক্ত বললে,—“এ বাড়ীর ঠিকানা তিনি জানেন—”

শিউরে উঠে বললুম,—“কি কোরে ?”

“মাসখানেক আগে যখন এ বাড়ী তোমার জন্তেই ভাড়া নেওয়া হয়, তখন আমি জানতুম।”

“তার পর ?”

“একদিন নদীর ধারে নরেনবাবুর সঙ্গে আমাকে লুকিয়ে কথা কইতে তিনি নিজের চোখে দেখেছিলেন।”

“তার পর ?”

“বামুণের পা ছুঁয়ে মিথ্যে বলতে পারলুম না বউ-মা, চ'লে আসবার দিন এ বাসার ঠিকানা বলে ফেললুম।”

এলিয়ে মুক্তর কোলের ওপরই চোখ বুজে শুয়ে পড়লুম।

অনেকক্ষণ পরে মুক্ত বললে,—“বউ-মা !”

“কেন মুক্ত ?”

“যদি তিনি নিজে তোমাকে ফিরিয়ে নিতে এসে পড়েন ?”

প্রাণপণ-বলে উঠে বোসে মুক্তর মুখ চেপে ধরলুম—“না মুক্ত, ও-কথা তোকে আমি বলতে দেব না। আমার ঋণ আমাকে সজ্ঞানে বইতে দে, পাগল কোরে দিয়ে আমার প্রায়শ্চিত্তের পথ তুই বন্ধ করে দিসনে—”

মুক্ত জোর করে তার মুখ ছাড়িয়ে নিয়ে বললে, “আমাকেও ত প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে বউ-মা ? টাকার সঙ্গে ত এঁকে ওজন কোরে ঘরে তুলতে পারব না !”

এ কথার আর জবাব দিলুম না, চোখ বুজে শুয়ে পড়লুম। মনে মনে বললুম,—“ওরে মুক্ত, পৃথিবী এখনও পৃথিবী আছে। আকাশ-কুসুমের কথা কাণেই শোনা যায়, তাকে ফুটতে কেউ আজও চোখে দেখেনি।”

ঘণ্টাখানেক পরে মুক্ত নীচে থেকে ভাত খেয়ে ফিরে এলো, তখন রাত্রি দশটা ! ঘরে ঢুকেই বললে,—“মাথায় আঁচলটা তুলে দাও বউ-মা, বাবু আসছেন”, বলেই বেরিয়ে গেল।

আবার এত রাত্রে ? তাড়াতাড়ি কাপড় সেরে উঠে বসতেই দেখলুম, দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে নরেন নয়,—আমার স্বামী।

বললেন,—“তোমাকে কিছুই বলতে হবে না। আমি জানি, তুমি আমারই আছ। বাড়ী চল।”

মনে মনে বললুম, “ভগবান্। এত যদি দিলে, তবে আরও একটু দাও—ওই দুটি পায়ে মাথা রাখবার সময়টুকু পর্যন্ত আমাকে সচেতন রাখো।”

একাদশী বৈরাগী

কালীদহ গ্রামটা ব্রাহ্মণ-প্রধান স্থান। ইহার গোপাল মুখ্যের ছেলে অপূর্ব ছেলেবেলা হইতেই ছেলেদের মোড়ল ছিল। এবার সে যখন বছর পাঁচ-ছয় কলিকাতার মেসে থাকিয়া অনার-সমেত বি-এ পাশ করিয়া বাড়ী ফিরিয়া আসিল, তখন গ্রামের মধ্যে তাহার প্রসার-প্রতিপত্তির আর অবধি রহিল না! গ্রামের মধ্যে জীর্ণ-শীর্ণ একটা হাই ইস্কুল ছিল,—তাহার সমবয়সীরা ইতিমধ্যে ইহাতেই পাঠ সাক্ষ করিয়া, সাক্ষাৎ ছাড়িয়া দিয়া দশ-আনা-ছ-আনা চুল ছাঁটিয়া বসিয়াছিল; কিন্তু কলিকাতা-প্রত্যাগত এই গ্রাজুয়েট ছোকরার মাথার চুল সমান করিয়া তাহারই মাঝখানে একখণ্ড নখর টিকির সংস্থান দেখিয়া, শুধু ছোকরা কেন, তাহাদের বাবা-দের পর্যন্ত বিস্ময়ে তাক লাগিয়া গেল। সহরের সভা-সমিতিতে যোগ দিয়া, জ্ঞানী লোকদিগের বক্তৃতা শুনিয়া, অপূর্ব সনাতন হিন্দুধর্মের অনেক নিগূঢ় রহস্যের মর্মোন্মেষ্ট করিয়া দেশে গিয়াছিল। এখন সঙ্গীদের মধ্যে ইহাই মুক্তকণ্ঠে প্রচার করিতে লাগিল যে, এই হিন্দুধর্মের মত এমন সনাতন ধর্ম আর নাই; কারণ ইহার প্রত্যেক ব্যবস্থাই বিজ্ঞান-সম্মত। টিকির বৈদ্যুতিক উপযোগিতা, দেহরক্ষা-ব্যাপারে সাক্ষাৎকের পরম উপকারিতা, কাঁচকলা ভরুণের রাসায়নিক প্রতিক্রিয়া, ইত্যাদি বহুবিধ অপরিজ্ঞাত তত্ত্বের ব্যাখ্যা শুনিয়া গ্রামের ছেলে-বুড়ো-নির্বিশেষে অভিভূত হইয়া গেল, এবং তাহার ফল হইল এই যে, অনতিকাল মধ্যেই ছেলেদের টিকি হইতে আরম্ভ করিয়া সাক্ষাৎ, একাদশী, পূর্ণিমা, ও গদ্যাস্ত্রানেক্ষেটায় বাড়ীর মেয়েরাও হার মানিল। হিন্দুধর্মের পুনরুদ্ধার, দেশোদ্ধার ইত্যাদির জল্পনায়-কল্পনায় যুবকমহলে একেবারে হৈ-হৈ পড়িয়া গেল।

বুড়ারা বলিতে লাগিল, “হ্যাঁ, গোপাল মুখুয্যের বরাত বটে ! মা কমলারও যেমন সুদৃষ্টি, সন্তান জন্মিয়াছেও তেমনি । না হইলে আজকালকার কালে এতগুলো ইংরাজী পাশ করিয়াও এই বয়সে এমনি ধৰ্ম্মে মতিগতি কয়টা দেখা যায় !” সুতরাং দেশের মধ্যে অপূর্ব, একটা অপূর্ব বস্তু হইয়া উঠিল । তাহার হিন্দুধৰ্ম্ম-প্রচারিণী ধূমপান-নিবারিণী ও দুর্নীতি-দলনী— এই তিন-তিনটা সভার আশ্কালানে গ্রামে চাষাভুষার স্নান পর্য্যন্ত সঙ্গস্ত হইয়া উঠিল । পাঁচকড়ি তেওর তাড়ি ধাইয়া তাহার জীকে প্রহার করিয়াছিল শুনিতে পাইয়া, অপূর্ব সদলবলে উপস্থিত হইয়া পাঁচকড়িকে এমনি শাসিত করিয়া দিল যে, পরদিন পাঁচকড়ির জী স্বামী লইয়া বাপের বাড়ী পলাইয়া গেল । ভগা কাওরা অনেক রাত্রে বিল হইতে মাছ ধরিয়া বাড়ী ফিরিবার পথে গাঁজার ঝোঁকে না কি বিছাসুন্দরের মালিনীর গান গাহিয়া যাইতেছিল ; ব্রাহ্মণপাড়ার অবিনাশের কাণে যাওয়ায়, সে তার নাক দিয়া রক্ত বাহির করিয়া তবে ছাড়িয়া দিল ! দুর্গা ডোমের চোদ্দ পনের বছরের ছেলে বিড়ি ধাইয়া মাঠে যাইতেছিল ; অপূর্বর দলের ছোকরার চোখে পড়ায়, সে তাহার পিঠের উপর সেই জ্বলন্ত বিড়ি চাপিয়া ধরিয়া ফোঁস্কা তুলিয়া দিল । এমনি করিয়া অপূর্বর হিন্দুধৰ্ম্ম-প্রচারিণী ও দুর্নীতি-দলনী সভা ভাঙ্গুমতীর আমগাছের মত সত্ত্বস্বস্তই ফুলেফলে কালীদহ গ্রামটাকে একেবারে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল । এইবার গ্রামের মানসিক উন্নতির দিকে নজর দিতে গিয়া অপূর্বর চোখে পড়িল যে, ইস্কুলের লাই-ব্রেরীতে শশিভূষণের দেড়খানা মানচিত্র ও বঙ্কিমের আড়াইখানা উপন্যাস ব্যতীত আর কিছুই নাই । এই দীনতার জন্ত দে হেডমাষ্টারকে অশেষ-রূপে লাঞ্চিত করিয়া অবশেষে নিজেই লাইব্রেরী গঠন করিতে কোমর বাঁধিয়া লাগিয়া গেল । তাহার সভাপতিত্বে চাঁদার খাতা, আইন-কানুনের তালিকা এবং পুস্তকের লিষ্ট তৈরী হইতে বিলম্ব হইল না । এতদিন ছেলেদের ধৰ্ম্মপ্রচারের উৎসাহ গ্রামের লোকেরা কোনমতে সহিয়াছিল ;

কিন্তু দুই-এক দিনের মধ্যেই তাহাদের চান্দা আদায়ের উৎসাহ গ্রামের ইতর-ভদ্র গৃহস্থের কাছে এমন ভয়াবহ হইয়া উঠিল যে, খাতা-বগলে ছেলে দেখিলেই তাহারা বাড়ীর দরজা-জানালা বন্ধ করিয়া ফেলিতে লাগিল। বেশ দেখা গেল, গ্রামে ধর্ম-প্রচার ও দুর্নীতি-দলনের রাস্তা যতখানি চওড়া পাওয়া গিয়াছিল লাইব্রেরীর জন্ত অর্থ-সংগ্রহের পথ তাহার শতাংশের একাংশও প্রশস্ত নয়। অপূর্ব কি করিবে ভাবিতেছে, এমন সময় হঠাৎ একটা ভারি সুরাহা চোখে পড়িল। ইন্সুলের অদূরে একটা পরিত্যক্ত, পোড়ো ভিটার প্রতি একদিন অপূর্ব দৃষ্টি আকৃষ্ট হইল। শোনা গেল, ইহা একদশী বৈরাগীর। অনুসন্ধান করিতে জানা গেল, লোকটা কি একটা গর্হিত সামাজিক অপরাধ করায় গ্রামের ব্রাহ্মণেরা তাহার ধোপা-নাপিত-মুদী প্রভৃতি বন্ধ করিয়া বছর-দশেক পূর্বে উদ্বাস্ত করিয়া নির্বাসিত করিয়াছেন। এখন সে ক্রোশ-দুই উত্তরে বারুইপুর গ্রামে বাস করিতেছে। লোকটা না কি টাকার কুমীর; কিন্তু, তাহার সাবেক নাম যে কি, তাহা কেহই বলিতে পারে না,—ইাড়ি-ফাটার ভয়ে বছরদিনের অব্যবহারে মানুষের স্মৃতি হইতে একেবারে লুপ্ত হইয়া গেছে। তদবধি এই একাদশী নামেই বৈরাগী মহাশয় সুপ্রসিদ্ধ। অপূর্ব তাল হুকিয়া কহিল, “টাকার কুমীর! সামাজিক কদাচার! তবে ত এই ব্যাটাই লাইব্রেরীর অর্ধেক ভার বহন করিতে বাধ্য। না হইলে সেখানের ধোপা, নাপিত, মুদীও বন্ধ! বারুইপুরের জমীদার ত দিদির মামাশুশুর।”

ছেলেরা মাতিয়া উঠিল, এবং অবিলম্বে ডোনেশনের খাতায় বৈরাগী নামের পিছনে একটা ‘মস্ত অঙ্কপাত’ হইয়া গেল। একাদশীর কাছে টাকা আদায় করা হইবে, না হইলে অপূর্ব তাহার দিদির মামাশুশুরকে বলিয়া বারুইপুরেও ধোপা-নাপিত বন্ধ করিবে, সংবাদ পাইয়া রসিক-স্বতন্ত্র লাইব্রেরীর মঙ্গলার্থ উপযাচক হইয়া পরামর্শ দিয়া গেলেন যে, বেশ একটু মোটা টাকা না দিলে মহাপাপী ব্যাটা কালীদেহে বাস্তু কি

করিয়া রক্ষা করে, দেখিতে হইবে। কারণ, বাস না করিলেও এই বাস্তুভিটার উপর একাদশীর যে অত্যন্ত মমতা, স্থিতিরত্নের তাহা অগোচর ছিল না। যেহেতু, বছর-দুই পূর্বে এই জমীটুকু খরিদ করিয়া নিজের বাগানের অঙ্গীভূত করিবার অভিপ্রায়ে সবিশেষ চেষ্টা করিয়াও তিনি সফলকাম হইতে পারেন নাই। তাঁহারু প্রস্তাবে তখন একাদশী অত্যন্ত সাধু-ব্যক্তির ন্যায় কাণে আঙুল দিয়া বলিয়াছিল, “এমন অসুমতি করবেন না ঠাকুর-মশাই, ঐ এক কোঁটা জমীর বদলে ব্রাহ্মণের কাছে দাম নিতে আমি কিছুতেই পারব না। ব্রাহ্মণের সেবায় সংগ্বে, এ তো আমাব সাত-পুরুষের ভাগ্য।” স্থিতিরত্ন নিরতিশয় পুলকিতচিত্তে তাহার দেব-দ্বিজে ভক্তি-শ্রদ্ধার লক্ষকোটি সূখ্যাতি করিয়া অসংখ্য আশীর্বাদ করার পরে, একাদশী করযোড়ে সাবনয়ে নিবেদন করিয়াছিল,—“কিন্তু এমনি পোড়া অদৃষ্ট, ঠাকুর-মশাই, যে সাত-পুরুষের ভিটে আমার কিছুতেই হাতছাড়া করবার জো নেই। বাবা মরণকালে মাথার দিব্যি দিয়ে বলে গিয়েছিলেন, খেতেও যদি না পাসু বাবা, বাস্তু-ভিটে কখনো ছাড়িস্ নে!” ইত্যাদি ইত্যাদি! সে আক্রোশ স্থিতিরত্ন বিন্ধত হন নাই।

দিন-পাঁচেক পরে, একদিন সকালবেলা এই ছেলের দলটি দুই ক্রোশ পথ হাঁটিয়া একাদশীর সদরে আসিয়া উপস্থিত হইল। বাড়ীটি মাটির, কিন্তু পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। দেখিলে মনে হয়, লক্ষ্মীত্ৰী আছে। অপূর্ণ কিংবা তাহার দলের আর কেহ-একাদশীকে পূর্বের কখনো দেখে নাই; সুতরাং চণ্ডীমণ্ডপে পা দিয়াই তাহাদের মন বিতৃষ্ণায় ভরিয়া গেল। এ লোক টাকার কুমীরই হোক, হাড়রই হোক, লাইব্রেরীর সম্বন্ধে যৈ পুঁটি মাছটির উপকারে আসিবে না, তাহা নিঃসন্দেহ। একাদশীর পেশা তেজারতি। বয়স বাটের উপর গিয়াছে। সমস্ত দেহ যেমন শীর্ণ, তেমন শুষ্ক। কণ্ঠেরা তুলসীর মালা। দাড়ি-গৌর কামানো

মুখধানার প্রতি চাহিলে মনে হয় না যে, কোথাও ইহার লেশমাত্র রসকস আছে। ইক্ষু যেমন নিজের রস কলের পেষণে বাহির করিয়া দিয়া, অবশেষে নিজেই ইন্ধন হইয়া তাহাকে জ্বালাইয়া শুষ্ক করে, এ ব্যক্তি যেন তেমনি মানুষকে পুড়াইয়া শুষ্ক করিবার জন্তই নিজের সমস্ত মনুষ্যত্বকে নিঙুড়াইয়া বিসর্জিত দিয়া ‘মহাজন’ হইয়া বসিয়া আছে। তাহার শুধু চেহারা দেখিয়াই অপূর্ব মনে মনে দমিয়া গেল। চণ্ডী-মণ্ডপের উপর ঢালা-বিছানা। মাঝখানে একাদশী বিরাজ করিতেছে। তাহার সম্মুখে একটা কাঠের হাত-বাল্ল, এবং একপাশে থাক-দেওয়া হিসেবের খাতাপত্র ! একজন বৃদ্ধ-গোছের গোমস্তা খালি গায়ে পৈতার গোছা গলায় ঝুলাইয়া, স্লেটের উপর সূদের হিসাব করিতেছে ; এবং সম্মুখে, পার্শ্বে, বারান্দায় খুঁটির আড়ালে নানা বয়সের নানা অবস্থার স্ত্রী-পুরুষ, স্নানমুখে বসিয়া আছে ! কেহ ঋণ গ্রহণ করিতে, কেহ সূদ দিতে, কেহ বা শুধু সময় ভিক্ষা করিতেই আসিয়াছে ;—কিন্তু ঋণ পরিশোধের জন্ত কেহ যে বসিয়াছিল, তাহা কাহারও মুখ দেখিয়া মনে হইল না।

অকস্মাৎ কয়েকজন অপরিচিত ভদ্রসন্তান দেখিয়া একাদশী বিস্ময়াপন্ন হইয়া চাহিল। গোমস্তা স্লেটখানা রাখিয়া দিয়া কহিল, “কোথেকে আসছেন ?”

অপূর্ব কহিল, “কালীদহ থেকে।”

“মশায় আপনারা ?”

“আমরা সবাই ব্রাহ্মণ।”

ব্রাহ্মণ গুনিয়া একাদশী সসজ্জমে উঠিয়া দাঁড়াইয়া ষাড় বুঁকাইয়া প্রণাম করিল ; কহিল, “বোসুতে আজ্ঞা হোক।”

সকলে উপবেশন করিলে একাদশী নিজেও বসিল। গোমস্তা প্রশ্ন করিল, “আপনাদের কি প্রয়োজন ?”

অপূর্ব লাইব্রেরীর উপকাবিতা-সম্বন্ধে সামান্য একটু ভূমিকা করিয়া চাদার কথা পাড়িতে গিয়া দেখিল, একাদশীর ঘাড় আর একদিকে ফিরিয়া গিয়াছে। সে খুঁটির, আড়ালের জ্বীলোককে সম্বোধন করিয়া কহিতেছে, “তুমি কি ক্ষেপে গেলে হারুর-মা ? সুদ ত হয়েছে কুল্লে সাত টাকা ছ’আনা ; তার ছ’আনা যদি ছাড় করে নেবে, তার চেয়ে আমার গলায় পা দিয়ে জিভ বের করে মেরে ফেল না কেন ?”

তার পরে উভয়ে এমনি ধ্বস্তাধ্বস্তি শুরু করিয়া দিল,—যেন এই ছ’আনা পয়সার উপরেই তাহাদের জীবন নির্ভর করিতেছে। কিন্তু হারুর-মাও যেমন স্থিরসঙ্কল্প, একাদশীও তেমনি অটল। দেবী হইতেছে দেখিয়া, অপূর্ব উভয়ের বাগবিতণ্ডার মাঝখানেই বলিয়া উঠিল, “আমাদের লাইব্রেরীর কথাটা—”

একাদশী মুখ ফিরাইয়া বলিল, “আজ্ঞে, এই যে শুনি ;—হাঁ রে নফর, তুই কি আমাকে মাথায় পা দিয়ে ডুবুতে চাস্ রে। সে ছ’টাকা এখনো শোধ দিলিনে, আবার একটাকা চাইতে এসেছিস্ কোন্ লজ্জায় শুনি ? বলি সুদটুদ কিছু এনেছিস্ ?”

নফর ট্যাক খুলিয়া এক আনা পয়সা বাহির করিতেই একাদশী চোখ রাঙাইয়া কহিল, “তিন মাস হয়ে গেল নারে ? আর ছ’টো পয়সা কই ?”

নফর হাত জোড় করিয়া বলিল, “আর নেই কর্তা ; খাড়াপোর কত হাতে-পায়ে প’ড়ে পয়সা চারিটি খার ক’রে আন্চি, বাকি ছ’টো পয়সা আস্তে হাট-বারেই দিয়ে যাবো।”

একাদশী গলা বাড়াইয়া দেখিয়া বলিল, “দেখি তোর ওদিকের ট্যাক্টা ?”

নফর বা-দিকের ট্যাক্টা দেখাইয়া অভিমানভরে কহিল, “ছ’টো পয়সার জন্য মিছে কথা কইচি কর্তা ? যে শালা পয়সা এনেও তোমারে ঠকায়, তার মুখে পোকা পড়ুক—এই বলে দিলুম।”

একাদশী তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে চাহিয়া কহিল, “তুই চারটে পয়সা ধার কোরে আনতে পারলি, আর দু’টো এমনি ধার কর্ত্তে পারলিনে ?”

নফর রাগিয়া কহিল, “মাইরি দিবাশা করলুম না কর্ত্তা ! মুখে পোকা পড়ুক—”

অপূর্বর গা জলিয়া যাইতেছিল, সে আর সহ করিতে না পারিয়া বলিয়া উঠিল, “আচ্ছা লোক ত তুমি মশাই !”

একাদশী একবার চাহিয়া দেখিল মাত্র,—কোন কথা কহিল না। পরাণ বাগ্দী স্নায়ুখের উঠান দিয়া যাইতেছিল ; একাদশী হাত নাড়িয়া ডাকিয়া বলিল, “পরাণ, নফরার কাছাটা একবার খুলে দেখ ত রে পয়সা দু’টো বাধা আছে না কি ?”

পরাণ উঠিয়া আসিতেই নফর রাগ করিয়া তাহার কাছার খুঁটে বাধা পয়সা দু’টো খুলিয়া একাদশীর সামনে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিল। একাদশী এই বেয়াদপিতে কিছুমাত্র রাগ করিল না। গম্ভীর-মুখে পয়সা ছয়টা বাস্তে তুলিয়া রাখিয়া গোমস্তাকে কহিল, “ঘোষাল-মশাই নফরার নামে সূদ আদায় জমা ক’রে নেন। হাঁ রে, একটা টাকা কি আবার কোরবি রে ?”

নফর কহিল, “আবশ্যক না হ’লেই কি এয়েচি মশাই ?”

একাদশী কহিল, “আট আনা নিয়ে যা না ! গোটা টাকা নিয়ে গেলেই ত নয়-ছয় করে ফেলুবি রে !”

তার পর অনেক ক’বা মাজা করিয়া, নফর মোড়ল বারো আনা পয়সা কর্ত্ত লইয়া প্রস্থান করিল।

বেলা বাড়িয়া উঠিতেছিল। অপূর্বর সঙ্গী অনাথ চাঁদার খাতাটী একাদশীর সম্মুখে নিক্ষেপ করিয়া কহিল, “যা দেবেন দিগ্বে দিন মশাই, আমরা আর দেরী কর্ত্তে পারিনে।”

একাদশী খাতাটা তুলিয়া লইয়া প্রায় পোনের মিনিট ধরিয়া

আগাগোড়া ভরভর করিয়া নিরীক্ষণ করিয়া, শেষে একটা নিখাস ফেলিয়া খাতাটা ফিরাইয়া দিয়া বলিল, “আমি বুড়ো-মানুষ, আমার কাছে আবার চাঁদা কেন ?”

অপূর্ব কোনমতে রাগ সামলাইয়া কহিল, “বুড়ো মানুষ টাকা দেবে না ত ছোট ছেলেতে টাকা দেবে ? জ্বরী পাবে কোথায় শুনি ?”

বুড়া সে কথার উত্তর না দিয়া কহিল, “ইস্কুল ত হয়েছে কুড়ি পঁচিশ বছর ; কৈ, এতদিন ত একেউ লাইব্রেরীর কথা তোলে নি বাপু ? তা যাক, এ তো আর মন্দ কাজ নয়,—আমাদের ছেলেপুলে বই পড়ুক আর না পড়ুক, আমার গাঁয়ের ছেলেরাই পড়বে ত ! কি বল ঘোষাল-মশাই ?” ঘোষাল ঘাড় নাড়িয়া কি যে বলিল বোঝা গেল না। একাদশী কহিল, “তা বেশ, চাঁদা দেব আমি,—একদিন এসে নিয়ে যাবেন চার আনা পয়সা। কি বল ঘোষাল, এর কমে আর ভাল দেখায় না ! অতদূর থেকে ছেলেরা এসে ধরেচে—যা’হোক একটু নাম-ডাক আছে বলেই ত ? আরও ত লোক আছে তাদের কাছে ত চাইতে যায় না,—কি বল হে ?”

ক্রোধে অপূর্বর মুখ দিয়া কথা বাহির হইল না। অনাথ কহিল, “এই চার আনার জন্তে আমরা এত দূবে এসেচি ? তাও আবার আর একদিন এসে নিয়ে যেতে হবে ?” একাদশী মুখে একটা শব্দ করিয়া মাথা নাড়িয়া নাড়িয়া বলিতে লাগিল, “দেখলেন ত অবস্থা,—ছ’টা পয়সা হকের সূদ আদায় করতে ব্যাটাদের কাছে কি ছাঁচড়াপনাই না করতে হয় ? তা, এ পাট-টা বিক্রী না হয়ে গেলে আর চাঁদা দেবার সুবিধে—”

• অপূর্বর রাগে ঠোট কাঁপিতে লাগিল ; বলিল, “সুবিধে হবে এখানেও ধোপা-নাপিত বন্ধ হলে। ব্যাটা পিশাচ সর্ব্বাঙ্গে ছিটে কোঁটা কেটে জাত হারিয়ে বোষ্টম হয়েছেন,—আচ্ছা !”

বিপিন উঠিয়া দাঁড়াইয়া একটা আঙ্গুল তুলিয়া শাসাইয়া কহিল, “বারুইপুরের রাখালদাসবাবু আমাদের কুটুম—মনে থাকে যেন বৈরাগী !”

বুড়া বৈরাগী এই অভাবনীয় কাণ্ডে হতবুদ্ধি হইয়া চাহিয়া রহিল। বিদেশী ছেলেদের অকস্মাৎ এত ক্রোধের হেতু সে কিছুতেই বুঝিতে পারিল না। অপূর্ব বলিল, “গরীবের রক্ত শুধে খাওয়া তোমার দার কোরব, তবে ছাড়ব।”

নফর তখনও বসিয়াছিল; তাহার কাছায়-বাঁধা পয়সা-দু’টো আদায় করার রাগে মনে মনে ফুলিতেছিল; সে কহিল, “যা কইলেন কর্তা, তা ঠিক। বৈরাগী নয়—পিচেশ! চোখে দেখলেম তো কি কোরে মোর পয়সা দু’টো আদায় নিলে!”

বুড়ার লাঞ্ছনায়, উপস্থিত সকলেই মনে-মনে নির্মল আনন্দ উপভোগ করিতে লাগিল। তাহাদের মুখের ভাব লক্ষ্য করিয়া বিপিন উৎসাহিত হইয়া চোখ টিপিয়া বলিয়া উঠিল, “তোমরা ত ভেতরের কথা জানো না—কিন্তু আমাদের গাঁয়ের লোক,—আমরা সব জানি। কি গো বুড়ো, আমাদের গাঁয়ে কেন তোমার ধোপা-নাপ্তে বন্ধ হয়েছিল বোলব?”

ধবরটা পুরাতন। সবাই জানিত। একাদশী সদগোপের ছেলে—জাত-বৈষ্ণব নহে। তাহার একমাত্র বৈমাত্রের ভগিনী প্রলোভনে পড়িয়া কুলের বাহির হইয়া গেলে, একাদশী অনেক দূরে, অনেক অমুসন্ধান, তাহাকে ঘরে ফিরাইয়া আনে। কিন্তু, এই কদাচারে গ্রামের লোক বিস্মিত ও অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া উঠে। তথাপি একাদশী মা-বাপ-মরা এই বৈমাত্র ছোট-বোনটিকে কিছুতেই পরিত্যাগ করিতে পারে নাই। সংসারে তাহার আর কেহ ছিল না; ইহাকেই সে শিশুকাল হইতে কোলে-পিঠে করিয়া মানুষ করিয়াছিল; তাহার ঘটা করিয়া বিবাহ দিয়াছিল; আবরণ অল্প বয়সে বিধবা হইয়া গেলে, দাদার ঘরেই সে আদর যত্নে ফিরিয়া আসিয়াছিল। বয়স এবং বুদ্ধির দোষে সেই ভগিনীর এত বড় পদস্থলনে বন্ধ কাঁদিয়া ভাসাইয়া দিল; আহার-নিদ্রা ত্যাগ করিয়া গ্রামে গ্রামে সহরে সহরে ঘুরিয়া, অবশেষে যখন তাহার সন্ধান পাইয়া তাহাকে ঘরে

ফিরাইয়া আনিল, তখন গ্রামের লোকের নির্ভর অমুশাসন মাধায় তুলিয়া লইয়া, তাহার এই লজ্জিতা, একান্ত অনুভব করিয়া দুর্ভাগিনী ভগিনীটিকে আবার গৃহের বাহির করিয়া দিয়া, নিজে প্রায়শ্চিত্ত করিয়া জাতে উঠিতে একাদশী কোনমতেই রাজী হইতে পারিল না। অতঃপর গ্রামে তাহার ধোপা-নাশিত, মুদী প্রভৃতি বন্ধ হইয়া গেল। একাদশী নিরুপায় হইয়া ভেক লইয়া বৈষ্ণব হইয়া এই বারুইপুরে পলাইয়া আসিল। কথাটা সবাই জানিত; তথাপি আর একজনের মুখ হইতে আর একজনের কলঙ্ক কাহিনীর মাধুর্য্যটা উপভোগ করিবার জন্ত সবাই উদ্গ্রীব হইয়া উঠিল। কিন্তু, একাদশী লজ্জায়, ভয়ে, একেবারে জড়সড় হইয়া গেল। তাহার নিজের জন্ত নয়, ছোট-বোনটির জন্ত। প্রথম-যৌবনের অপরাধ গৌরীর বুকের মধ্যে যে গভীর ক্ষতের সৃষ্টি করিয়াছিল, আজিও যে তাহা তেমনি আছে, তিলান্বিতও শুষ্ক হয় নাই, বৃদ্ধ তাহা ভালরূপেই জানিত। পাছে বিন্দুমাত্র ইজিতও তাহার কাণে গিয়া সেই ব্যথা আলোড়িত হইয়া উঠে, এই আশঙ্কায় একাদশী বিবর্ণমুখে নিঃশব্দে চাহিয়া রহিল। তাহার এই সঙ্কল্প দৃষ্টির নীরব-মিনতি আর কাহারও চক্ষে পড়িল না, কিন্তু, অপূর্ণ হঠাৎ অনুভব করিয়া বিশ্বয়ে অবাক হইয়া গেল।

বিপিন বলিতে লাগিল, “আমরা কি ভিখারী যে, দু’কোশ পথ হেঁটে এই রোদ্দে চারগুণা পয়সা ভিক্ষে চাইতে এসেছি! তাও আবার আজ নয়,—কবে ওঁর কোন্ খাতকের পাট বিক্রী হবে, সেই খবর নিয়ে আমাদের আর একদিন হাঁটতে হবে। তবে যদি বাবুর দয়া হয়! কিন্তু লোকের রক্ত শুধে স্নেহ খাও বুড়ো, মনে করেছ জোঁকের গায়ে জোঁক বসে না? আমি এখানেও না তোমার হাড়ির হাল করি ত আমার নাম বিপিন ভট্টাচার্য্যই নয়! ছোট-জাতের পয়সা হ’য়েচে বলে চোখে-কাণে আর দেখতে পাও না? চল হে অপূর্ণ, আমরা যাই—তার পরে যা জানি, করা যাবে।” বলিয়া সে অপূর্ণের হাত ধরিয়া টান দিল।

বেলা এগারটা বাজিয়া গিয়াছিল ; বিশেষতঃ, এতটা পথ হাঁটিয়া আসিয়া অপূর্বর অত্যন্ত শিপাসা বোধ হওয়ায় কিছুক্ষণ পূর্বে চাকরটাকে সে জল আনিতে বলিয়া দিয়াছিল। তাহার পর কলহ-বিবাদে সে কথা মনে ছিল না। কিন্তু তাহারই তৃষ্ণার জল একহাতে এবং অন্য হাতে রেকাবীতে গুটিকয়েক বাতাসা লুইয়া, একটি সাতাশ-আটাশ বছরের বিধবা মেয়ে পার্শ্বের দরজা ঠেলিয়া ভিতরে প্রবেশ করিতে, তাহার জল চাওয়ার কথা স্মরণ হইল। গৌরীকে ছোট্ট-জাতের মেয়ে বলিয়া কিছুতেই মনে হয় না। পরণে গরদের কাপড় ; স্নানের পর বোধ করি এইমাত্র আর্হিক করিতে বসিয়াছিল,—ব্রাহ্মণ জল চাহিয়াছে, চাকরের কাছে শুনিয়া, সে আর্হিক ফেলিয়া ছুটিয়া আসিয়াছে। কহিল, “আপনাদের কে জল চেয়েছিলেন যে।”

বিপিন কহিল, “পাটের শাড়ী পরে এলেই বুঝি তোমার হাতে জল ধাবো আমরা ? অপূর্ব, ইনিই সে বিত্তেধরী হে।”

চক্কর নিমিষে মেয়েটির হাত হইতে বাতাসার রেকাবটা বনাৎ করিয়া নীচে পড়িয়া গেল এবং সেই অসীম লজ্জা চোখে দেখিয়া অপূর্ব নিজেই লজ্জায় মরিয়া গেল। সক্রোধে বিপিনকে একটা কল্লুরের গুঁতো মারিয়া কহিল, “এ-সব কি বাদরামি হচ্ছে ? কাণ্ডজ্ঞান নেই ?”

বিপিন পাড়াগাঁয়ে মানুষ—কলহের মুখে অপমান করিতে নর-নারী ভেদাভেদ-জ্ঞান-বিবর্জিত নিরপেক্ষ বীরপুরুষ। সে অপূর্বের ধোঁতা ধাইয়া আরও নিষ্ঠুর হইয়া উঠিল। চোখ রাঙাইয়া হাঁকিয়া কহিল, “কেন মিছে কথা বল্চি না কি ? ওর এত বড় সাহস যে, বামুণের ছেলের জন্তে জল আনে ? আমি হাটে হাঁড়ি ভেঙে দিতে পারি জানো ?”

অপূর্ব বুঝিল, আর তর্ক নয়। অপমানের মাত্রা তাহাতে বাড়িবে বই কমিবে না। কহিল, “আমি আনতে বলেছিলুম বিপিন, তুমি না জেনে অনর্থক ঝগড়া কোরো না ; চল, আমরা এখন যাই।”

গৌরী রেকাবীটি কুড়াইয়া লইয়া, কাহারও প্রতি দৃষ্টিপাত না করিয়া নিঃশব্দে দরজার আড়ালে গিয়া দাঁড়াইল। তন্না হইতে কহিল, “দাদা, এঁরা যে কিসের চাঁদা নিতে এসেছিলেন, তুমি দিয়েচ ?”

একাদশী এতক্ষণ পর্য্যন্ত বিশ্বলের ত্রায় বসিয়াছিল, ভগিনীর আস্থানে চকিত হইয়া বলিল, “না ; এই জ্ব দিই দিদি।”

অপূর্বের প্রতি চাহিয়া হাতযোড় করিয়া কহিল, “বীৰু-মশাই, আমি গরীব-মামুষ ; চার আনাই আমার পক্ষে ঢের—দয়া ক’রে নিন।”

বিপিন পুনরায় কি একটা কড়া জবাব দিতে উদ্বৃত্ত হইয়াছিল, অপূর্ব ইচ্ছিতে তাহাকে নিষেধ করিল ; কিন্তু, এত কাণ্ডের পর সেই চার আনার প্রস্তাবে তাহার নিজেরও অত্যন্ত ঘৃণাবোধ হইল। আত্মসংবরণ করিয়া কহিল, “থাক্ বৈরাগী, তোমার কিছু দিতে হবে না।”

একাদশী বুঝিল, ইহা রাগের কথা ; একটা নিশ্বাস ফেলিয়া কহিল, “কলিকাল ! বাগে পেলো কেউ কি কারও ঘাড় ভাঙতে ছাড়ে ! দাও ঘোষাল-মশাই, পাঁচগুণা পয়লাই খাতায় ধরচ লেখো। কি আর কোরব বল !” বলিয়া বৈরাগী পুনরায় একটা দীর্ঘশ্বাস মোচন করিল। তাহার মুখ দেখিয়া অপূর্বের এবার হাসি পাইল ! এই কুসীদজীবী বৃদ্ধের পক্ষে চার আনার এবং পাঁচ আনার মধ্যে কত বড় যে প্রকাণ্ড প্রভেদ, তাহা সে মনে মনে বুঝিল ; যুহ হাসিয়া কহিল, “থাক্ বৈরাগী, তোমার দিতে হবে না ! আমরা চার-পাঁচ আনা পয়লা চাঁদা নিইনে ! আমরা চল্লম।”

কি জানি, কেন অপূর্ব একান্ত আশা করিয়াছিল, এই পাঁচ আনার বিরুদ্ধে দ্বারের অন্তরাল হইতে অন্ততঃ একটা প্রতিবাদ আসিবে। তাহার অঞ্চলের প্রান্তটুকু তখনও দেখা যাইতেছিল, কিন্তু সে কোন কথা কহিল না। যাইবার পূর্বে অপূর্ব যথার্থ-ই ক্ষোভের সহিত মনে মনে কহিল, “ইহারা বাস্তবিকই অত্যন্ত ক্ষুদ্র। দান করা সম্বন্ধে পাঁচ

আনা পয়সার অধিক ইহাদের ধারণাই নাই। পয়সাই ইহাদের প্রাণ, পয়সাই ইহাদের অস্থি-মাংস, পয়সার জন্ত ইহারা করিতে পারে না, এমন কাজ সংসারে নাই।”

অপূর্ব সদলবলে উঠিয়া দাঁড়াইতেই, একটি বছর-দশেকের ছেলের প্রতি অনাথের দৃষ্টি পড়িল। ছেলেটির গলায় উত্তরীয়, বোধ করি, পিতৃ-বিয়োগ কিংবা এমন কিছু একটা ঘটিয়া থাকিবে। তাহার বিধবা জননী বারান্দায় খুঁটির আড়ালে বসিয়াছিল। অনাথ আশ্চর্য্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, “পুঁটে, তুই যে এখানে?”

পুঁটে আঙুল দেখাইয়া কহিল, “আমার মা বসে আছেন। মা বল্লেন, আমাদের অনেক টাকা ওঁর কাছে জমা আছে।” বলিয়া সে একাদশীকে দেখাইয়া দিল। কথাটা শুনিয়া সকলেই বিস্মিত ও কোতূহলী হইয়া উঠিল। ইহার শেষ পর্য্যন্ত কি দাঁড়ায়, দেখিবার জন্ত অপূর্ব নিজের আকর্ষণ পিপাসা-সত্ত্বেও বিপিনের হাত ধরিয়া বসিয়া পড়িল।

একাদশী প্রশ্ন করিল, “তোমার নামটি কি বাবা? বাড়ী কোথায়?”

ছেলেটি কহিল, “আমার নাম শশধর; বাড়ী ওঁদের গাঁয়ে—কালীদহে।”

“তোমার বাবার নামটি কি?”

ছেলেটির হইয়া এবাব অনাথ জবাব দিল; কহিল, “এর বাপ অনেক দিন মারা গেছে। পিতামহ রামলোচন চাটুয্যে ছেলের মৃত্যুর পর সংসার ছেড়ে বেরিয়ে গিয়েছিলেন; সাত বৎসর পরে মাসখানেক হ’ল ফিরে এসেছিলেন। পরন্তু এদের ঘরে আগুন লাগে, আগুন নিবাতে গিয়ে বুদ্ধ মারা পড়েছেন। আর কেউ নেই, এই নাতিটিই শ্রাদ্ধাধিকারী।”

কাহিনী শুনিয়া সকলেই হৃৎকম্প প্রকাশ করিল, শুধু একাদশী চুপ করিয়া রহিল। একটু পরেই প্রশ্ন করিল, “টাকার হাতচিঠা আছে? যাও, তোমার মাকে জিজ্ঞাসা ক’রে এসো।”

ছেলেটি জিজ্ঞাসা করিয়া আসিয়া কহিল, “কাগজপত্র কিছু নেই—
সব পুড়ে গেছে।”

একাদশী প্রশ্ন করিল, “কত টাকা ?”

এবার বিধবা অগ্রসর হইয়া আসিয়া মাথার কাপড়টা সরাইয়া জবাব
দিল, “ঠাকুর মন্সবার আগে ব’লে গেছেন, পাঁচশ’ টাকা তিনি জমা রেখে
তীর্থযাত্রা করেন। বাবা, আমরা বড় গরীব; সব টাকা না দাও, কিছু
আমাদের ভিক্ষে দাও” বলিয়া বিধবা টিপিয়া টিপিয়া কাঁদিতে লাগিল।
ঘোষাল-মশাই এতক্ষণ খাতা লেখা ছাড়িয়া একাগ্রচিত্তে শুনিতেন—
ছিলেন; তিনিই অগ্রসর হইয়া প্রশ্ন করিলেন, “বলি কেউ সাক্ষী-টাক্ষী
আছে ?”

বিধবা ঘাড় নাড়িয়া বলিল, “না। আমরাও জানিতুম না ঠাকুর
গোপনে টাকা জমা রেখে বেরিয়ে গিয়েছিলেন!”

ঘোষাল মৃদুহাস্ত করিয়া বলিলেন, “শুধু কাঁদলেই ত হয় না বাপু!
এসব মবলগ্ টাকাকড়ির কাণ্ড যে! সাক্ষী নেই, হাতচিঠা নেই, তাহ’লে
কি রকম হবে বল দেখি ?”

বিধবা ফুলিয়া-ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিল; কিন্তু, কান্নার ফল যে কি
হইবে, তাহা কাহারও বুঝিতে বাঞ্ছী রহিল না। একাদশী এবার কথা
কহিল; ঘোষালের প্রতি চাহিয়া কহিল, “আমার মনে হচ্ছে, যেন পাঁচশ’
টাকা কে জমা রেখে আর নেয় নি। তুমি একবার পুরোনো খাতাগুলো
খুঁজে দেখ দিকি, কিছুলেখা-টেখা আছে না কি ?”

ঘোষাল বন্ধার দিয়া কহিল, “কে এত বেলায় ভূতের ব্যাগার খাটতে
যাবে বাবু? সাক্ষী নেই, রসিদ পত্তর নেই—”

কথাটা শেষ হইবার পূর্বেই দ্বারের অন্তরাল হইতে জবাব আসিল,
“রসিদ-পত্তর নেই ব’লে কি ব্রাহ্মণের টাকাটা ডুবে যাবে না কি?
পুরানো খাতা দেখুন—আপনি না পারেন আমাকে দিন, দেখে দিচ্ছি।”

সকলেই বিস্মিত হইয়া দ্বারের প্রতি দৌধ তুলিল ; কিন্তু, যে ছকুম দিল, তাহাকে দেখা গেল না ।

ঘোষাল নরম হইয়া কহিল, “কত বছর হয়ে গেল মা ! এতদিনের খাতা খুঁজে বার করা ত সোজা নয় । খাতাপত্রের আঙুল ! তা জমা থাকে, পাওয়া যাবে বৈ কি !” বিধবাকে উদ্দেশ্য করিয়া কহিল, “তুমি বাছা কেঁদো না,—হকের টাকা হয় ত, পাবে বৈ কি । আচ্ছা, কাল একবার আমার বাড়ী যেয়ো ; সব কথা জিজ্ঞাসা করে খাতা দেখে বার কোরে দেব ! আজ এত বেলায় ত আর হবে না !”

বিধবা তৎক্ষণাৎ সম্মত হইয়া কহিল, “আচ্ছা, বাবা, কাল সকালেই আপনার ওখানে যাবো ।”

“যেহেঁতু” বলিয়া ঘোষাল ঘাড় নাড়িয়া সম্মুখের খোলা খাতা সেদিনের মত বন্ধ করিয়া ফেলিল ।

কিন্তু জিজ্ঞাসাবাদের ছলে বিধবাকে বাড়ীতে আহ্বান করার অর্থ অত্যন্ত সুস্পষ্ট । অন্তরাল হইতে গৌরী কহিল, “আট বছর আগের—তাহলে ১৩০১ সালের খাতাটা একবার খুলে দেখুন ত, টাকা জমা আছে কি না ?”

ঘোষাল কহিলেন, “এত তাড়াতাড়ি কিসের মা !”

গৌরী কহিল, “আমাকে দিন, আমি দেখে দিচ্ছি । ব্রাহ্মণের মেয়ে দু’কোশ হেঁটে এসেছেন—দু’কোশ এই রোদ্দে হেঁটে যাবেন, আবার কাল আপনার কাছে আসবেন—এত হাদ্যমায় কার্জ কি ঘোষাল-কাকা ?”

একাদশী কহিল, “সত্যিই ত ঘোষাল-মশাই ; ব্রাহ্মণের মেয়েকে মিছামিছি হাঁটানো কি ভালো ? বাপরে ! দাও, দাও, চটপট দেখে দাও ।”

জুড় ঘোষাল তখন রুটকণ্ঠে উঠিয়া গিয়া পাশের ঘর হইতে ১৩০১ সালের খাতা বাহির করিয়া আনিলেন । মিনিট-দশেক পাতা উন্টাইয়া

হঠাৎ ভয়ানক ধুসী হইয়া বলিয়া উঠিলেন, “বাঃ ! আমার গৌরী-মায়ের কি স্নহ বৃদ্ধি । ঠিক এক মালের খাতাতেই জন্ম পাওয়া গেল ! এই যে রামলোচন-চাঁটুয়ের জমা পাঁচশ’—”

একাদশী কহিল, “দাও চটপট সুদটা ক’ষে দাও, ঘোষাল-মশাই !”

ঘোষাল বিস্মিত হইয়া কহিল, “আবার সুদ ?”

একাদশী কহিল, “বেশ, দিতে হবে নী ! টাকাটা একদিন খেটেচে ত, বোসে ত থাকেনি । আট বছরের সুদ—এই ক’মাস সুদ বাদ পড়বে ।”

তখন সুদে আসলে প্রায় সাড়ে সাতশ’ টাকা হইল । একাদশী ভগিনীকে লক্ষ্য করিয়া কহিল, “দিদি, টাকাটা তবে সিন্দুক থেকে বা’র কোরে আন । হাঁ বাছা, সব টাকাটাই এঁক সঙ্গে নিয়ে যাবে ত ?”

বিধবার অন্তরের কথা অন্তর্যামী শুনিলেন ; চোখ মুছিয়া প্রকাশে কহিল, “না বাবা, অত টাকায় আমার কাজ নেই ; আমাকে পঞ্চাশটি টাকা এখনি শুধু দাও ।”

“তাই নিয়ে যাও না । ঘোষাল-মশাই, খাতাটা একবার দাও, সই-কোরে দিই ; আর বাকি টাকার তুমি একটা চিঠি ক’রে দাও ।”

ঘোষাল কহিল, “আমিই সই কোরে দিচ্ছি । তুমি আবার—”

একাদশী কহিল, “না না, আমাকেই দাও না ঠাকুর, নিজের চোখে দেখে দিই ।” বলিয়া খাতা লইয়া অর্ধ-মিনিট চোখ বুলাইয়া হাসিয়া কহিল, “ঘোষাল-মশাই, এই যে একষোড়া আসল মুক্তো ব্রাহ্মণের নামে জমা রয়েছে । আমি জানি কি না—ঠাকুর-মশাই আমাদের সব সময়ে চোখে দেখতে পায় না,” বলিয়া একাদশী দরজার দিকে চাহিয়া একটু হাসিল । এতগুলি লোকের সম্মুখে মনিবের এই ব্যক্তোক্তি ঘোষালের মুখ কালি হইয়া গেল ।

সে দিনের সমস্ত কর্ম নির্বাহ হইলে, অপূর্ব সঙ্গীদের লইয়া যখন উত্তম পথের মধ্যে বাহির হইয়া পড়িল, তখন তাহার মনের মধ্যে একটা

বিপ্লব চলিতেছিল। ঘোষাল সঙ্গে ছিল; সে সবিনয় আস্থান করিয়া কহিল, “আম্বন, গরীবের ঘরে অন্ততঃ একটু গুড় দিয়েও জল খেয়ে যেতে হবে।”

অপূর্ব কোন কথা না কহিয়া নীরবে অনুসরণ করিল। ঘোষালের গা জলিয়া যাইতেছিল; সে একাদশীকে উদ্দেশ করিয়া কহিল, “দেখলেন, ছোটলোক ব্যাটার আশ্পর্ক! আপনাদের মত ব্রাহ্মণ-সন্তানের পায়ের ধূলো প’ড়েচে, হারামজাদার ঘোল-পুরুষের ভাগ্য; ব্যাটা পিশেচ কি না পাঁচগুণা পয়সা দিয়ে ভিখিরী বিদেয় কর্তে চায়।”

বিপিন কহিল, “হু’দিন সবুর করুন না; হারামজাদা মহাপাপীর ধোপা নাপতে বন্ধ ক’রে পাঁচগুণা পয়সা দেওয়া বা’র ক’রে দিচ্ছি। রাখালবাবু আমাদের কুটুম, সে মনে রাখবেন ঘোষাল-মশাই।”

ঘোষাল কহিল, “আমি ব্রাহ্মণ। হু’বেলা সন্ধ্যা-আহ্নিক না কোরে জলগ্রহণ করি নে, হু’টো মুক্তোর জন্তে কি রকম অপমানটা হুপুর-বেলায় আমাকে করলে, চোখে দেখলেন ত। ব্যাটার ভাল হবে? মনেও কোরবেন না। সে বেটী—যারে ছুঁলে নাইতে হয়,—কি না বামুণের ছেলের তেষ্ঠায় জল নিয়ে আসে। টাকার গুমরটা কি রকম হ’য়েচে, একবার ভেবে দেখুন দেখি।”

অপূর্ব এতক্ষণ একটা কথাতেও কথা যোগ করে নাই, সে হঠাৎ পথের মাঝখানে দাঁড়াইয়া পড়িয়া কহিল, “অনাথ, আমি ফিরে চল্লুম ভাই—আমার ভারি তেষ্ঠা পেয়েচে।”

ঘোষাল আশ্চর্য হইয়া কহিল, “ফিরে কোথায় যাবেন? ঐ ত আমার বাড়ী দেখা যাচ্ছে।”

অপূর্ব মাথা নাড়িয়া বলিল, “আপনি এদের নিয়ে যান,—আমি যাচ্ছি ঐ একাদশীর বাড়ীতেই জল খেতে।”

একাদশীর বাড়ীতে জল খেতে! সকলেই চোখ কপালে তুলিয়া

দাঁড়াইয়া পড়িল। বিপিন তাহার হাত ধরিয়া একটা টান দিয়া বলিল,
 “চল, চল, ছপুর্ রোদ্দুরে রাস্তার মাঝখানে আর চণ্ড করতে হবে না।
 তুমি সেই পাত্রই বটে! তুমি ধাংবে একাদশীর বোনের ছোয়া জল!”

অপূর্ব হাত টানিয়া লইয়া দৃঢ় স্বরে কহিল, “সত্যিই আমি তার
 দেওয়া সেই জলটুকু খাবার জন্তে ক্লিরে যাচ্ছি। তোমরা ঘোষাল-
 মশায়ের ওখান থেকে খেয়ে এসো—ঐ গাছতলায় আমি অপেক্ষা কোরে
 থাকুব।”

তাহার শাস্ত স্থির কণ্ঠস্বরে হতবুদ্ধি হইয়া ঘোষাল কহিল, “এর
 প্রায়শ্চিত্ত করতে হয়, তা জানেন?”

অনাথ কহিল, “ক্লেপে গেলে না কি?”

অপূর্ব কহিল, “তা জানি নে। কিন্তু, প্রায়শ্চিত্ত করতে যাচ্ছি।
 তখন ধীর-সুস্থে ভাবা যাবে। কিন্তু এখন ত পারলাম না”—বলিয়া সে
 এই ধর-রোদ্দুর মধ্যে দ্রুতপদে একাদশীর বাড়ীর উদ্দেশে প্রস্থান করিল।



গ্রন্থকার প্রণীত পুস্তকাবলী

১। বিরাজ-বো (ত্রয়োদশ সংস্করণ) ...	১৬০
ঐ হিন্দি সংস্করণ (প্রথম সংস্করণ) ...	১০
২। বিন্দু-ছন্দ (ত্রয়োদশ সংস্করণ) ...	২৮
৩। বড়দিদি (একাদশ সংস্করণ) ...	১৮
৪। পণ্ডিত মশাই (চতুর্থ সংস্করণ) ...	১০
৫। অরক্ষণীয়া (নবম সংস্করণ) ...	১০
৬। বৈকুণ্ঠের উল্লস (চতুর্থ সংস্করণ) ...	১৮
৭। মেজদিদি (ষষ্ঠ সংস্করণ) ...	১০
৮। চন্দ্রনাথ (ত্রয়োদশ সংস্করণ) ...	১০
৯। পরিণীতা (উনবিংশ সংস্করণ) ...	১৮
১০। দেবদাস (চতুর্থ সংস্করণ) ...	১১০
১১। শ্রীকান্ত—১ম পর্ব (পঞ্চম সংস্করণ) ...	১১০
১২। শ্রীকান্ত—২য় পর্ব (চতুর্থ সংস্করণ) ...	১১০
১৩। শ্রীকান্ত—৩য় পর্ব (চতুর্থ সংস্করণ) ...	১১০
১৪। কাশীনাথ (তৃতীয় সংস্করণ) ...	১১০
১৫। নিষ্কৃতি (পঞ্চম সংস্করণ) ...	১০
১৬। জরিত্রহীন (চতুর্থ সংস্করণ) ...	৩১০
১৭। স্বামী (ত্রয়োদশ সংস্করণ) ...	১৮
১৮। দস্তা (পঞ্চম সংস্করণ) ...	২১০
১৯। ছবি (চতুর্থ সংস্করণ) ...	১০
২০। গৃহদাহ (প্রথম সংস্করণ) ...	৪৮
২১। পল্লী-সমাজ (একাদশ সংস্করণ) ...	১০
২২। বামুনের মেয়ে (দ্বিতীয় সংস্করণ) ...	১৮
২৩। দেব-পাণ্ডব (তৃতীয় সংস্করণ) ...	২১০
২৪। নব-বিদ্বান (তৃতীয় সংস্করণ) ...	১১০
২৫। হরিলক্ষ্মী (দ্বিতীয় সংস্করণ) ...	১৮
২৬। মোড়শী [নাটক] (চতুর্থ সংস্করণ) ...	১৮
২৭। রামা [নাটক] (দ্বিতীয় সংস্করণ) ...	১৮
২৮। শেষ-প্রশ্ন (প্রথম সংস্করণ) ...	৭

দেবদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স, ২০৩/১১, কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা

